হারাধন

আনসার উদ্দিন আহাম্মদ ও আমি বাল্যবন্ধু, ক্লাস ফোর থেকে এক সঙ্গে পড়ি। আইএসসি পাস করে আমি বুয়েটে ভর্তি হই এবং থাকি ইঞ্জিনিয়ারিং হলে। তার দুই বছর পর আনসার বিএ পাস করে ঢাকা ইউনিভার্টিতে এমএ-তে ভর্তি হয় এবং থাকে এসএম হলে। আমাদের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীর। কাছাকাছি থাকার সুবাদে দুজনে প্রায়ই রমনা পার্কে বা রেললাইন (বর্তমানে রাস্তা) ধরে নিউ মার্কেটে যাই। যেখানেই যাই, বিকেলে উভয়ে এক কাপ করে চা খাই। চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে কতো যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। এমনি একদিন চা খেতে খেতে ঠিক করলাম আগামী ছুটিতে চা বাগানে যাবো।

আনসারের মামা শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত রশীদপুর টি এস্টেটের ম্যানেজার, থাকেন চা বাগানের বাংলোতে এবং চা বাগান পরিদর্শনের জন্য তার নিয়ন্ত্রণে কয়েকটা জিপ আছে। পাশেই রেস্ট হাউস এবং তাতে চারটা রুম। ফলে থাকা খাওয়া ও চলাচলের কোনো অসুবিধা নেই।

ছুটির শুরুতেই সুরমা মেইলে শ্রীমঙ্গল গেলাম। ট্রেন থেকে নেমেই দেখি জিপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। গাড়িতে চলতেই তা চললো স্বাভাবিক গতিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে চা বাগানে ঢুকলাম। পাহাড়ের ঢাল দিয়ে চলছি। রাস্তা সর্পিল। কি চমৎকার এ দৃশ্য। পাহাড়ের ঢালে সারিবদ্ধভাবে লাগানো চা গাছগুলো উচ্চতায় তিন থেকে চার ফিট হবে। গাছগুলো সমান করে কাটা, কাটা অংশটার ওপর সবুজ কুড়ি গজিয়েছে। চারদিকে সবুজ আর সবুজ।

চা বাগানের মাঝে প্রায় বিশ ত্রিশ ফিট দূরে দূরে বড় বড় গাছ লাগানো। চা গাছগুলোতে পরিমাণ মতো আলোছায়ার ব্যবস্থা করার জন্য বড় গাছগুলো লাগানো হয়েছে। নতুন গজানো কুড়িগুলো প্রয়োজনীয় পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে তুলে নিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চা তৈরি করা হয়।

সাত আট কিলোমিটার চলার পর এক পাহাড়ের চূড়ায় রেস্ট হাউসে পৌছালাম। পাশেই ম্যানেজারের বাংলো। গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে তাকালাম। অত্যন্ত সুন্দর এ দৃশ্য, দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

মেয়েটির নাম চম্পা, বয়স ষোল সতেরো হবে। তার কাজ রেস্ট হাউসের ঘরদোর ও বিছানাপত্র সাজানো গোছানো ও পরিষ্কার রাখা এবং অতিথিদের চা-নাশতা ও খাবার পরিবেশন করা।

নাশতা খাওয়ার পর চম্পা চা বানিয়ে দিল।

চমৎকার লাগলো তার তৈরি চা।

চা খাবার পর জিপে করে মামার সঙ্গে বের হলাম। মামা খুটিয়ে খুটিয়ে চার দিন ধরে বাগানের সব কিছু আমাদের দেখালেন। পাহাড়ি মেয়েরা চা পাতা ছিড়ছে। পাতা ছিড়তে ছিড়তে এক লাইনে এগোচ্ছে আর মাথার পেছনে বাধা ঝুড়িতে তা রাখছে। কাজ শেষে ঝুড়ি নিয়ে লাইন ধরে কারখানা অফিসে গেলে কারখানার বাবুরা ওজন করে চা পাতা বুঝে নিচ্ছেন।

পাহাড়িদের বসবাসের বস্তিগুলো দেখলাম। বস্তিগুলো লাইন ধরে সাজানো, কাছেই তাদের দৈনন্দিন কেনাকাটার ছোট বাজার।

কারখানা দেখলাম, শ্রমিকরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চা বানাচ্ছে এবং চায়ের গ্রেড লেখা প্যাকেটে তা ভর্তি করছে। দেখতে দেখতে প্রতিদিনই বিকেল হয়ে যেতো। রেস্ট হাউসে ফিরে হাত-মুখ ধোওয়া শেষে বাইরে আসতেই দেখতাম বাগানে চেয়ার-টেবিল সাজানো এবং চা প্রস্তুত।

চম্পা চা বানিয়ে দিতো। চা খাবার সময় টের পেতাম এর টেস্ট অন্য রকম। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টেস্টের চা খেয়ে বুঝতে পেরেছি, চম্পা চা বানাতে পটিয়সী। রাতে শুতে গিয়ে দেখেছি চম্পা ঘর সাজাতেও পটিয়সী।

বিছানার বেডকভার সরিয়ে ধোওয়া বেডশিট দিয়ে সুন্দর করে শয্যা রচনা করতো। টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাস-এ এক গোছা ফুল, জগে পানি, পাশে উপুড় করা গ্লাস এবং বেডসুইচটা হাতের কাছে।

এমনি অতিথেয়তার মধ্য কখন যে চার দিন কেটে গেল টেরও পাইনি। চতুর্থ দিন বিকেলে চা খেতে খেতে ভাবছি, দিন তো ফুরিয়ে গেল, আগামীকাল ভোরে চলে যেতে হবে। চম্পা আমাদের জন্য অনেক খেটেছে, তাকে কিছু একটা উপহার দেয়া প্রয়োজন।

বিকেলে দুই বন্ধু শ্রীমঙ্গল গিয়ে একটা সোনার চেইন কিনে আনলাম। আনসার চেইনটা চম্পাকে দেবে বলে তার কাছে রেখে দিল।

রাতে খাওয়ার পর বাইরে বসে গল্প হচ্ছিল। মামাও সঙ্গে আছেন।

চম্পা সুন্দর করে চা বানিয়ে দিল।

সবাই তৃপ্তি সহকারে চা খেলাম।

পরদিন ভোরে উঠতে হবে বলে আমাদের শুতে বলে মামা চলে গেলেন।

আনসার রুমে গেল।

আমি চুপচাপ বসে বসে ভাবছি।

মিনিট বিশেক পরে আনসার এসে বললো, বন্ধু, চম্পা চেইন পেয়ে খুব খুশি, তুমি রুমে যাও। কিছু আচ করতে না পেরে রুমে গেলাম।

রুমে ঢুকে তো হতবাক। এক উত্তাল যৌবনা, অর্ধনগ্না নারী তার অতৃপ্ত বাসনার ডালি সাজিয়ে শুয়ে আছে, তার গলায় সোনার চেইনটি জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

বুঝলাম মৌচাকে ঢিল দিয়ে আনসার সরে পড়েছে। চম্পাকে টেনে বের করে দেয়ার উদ্দেশ্যে কাছে গেলাম। সে অকস্মাৎ আমাকে সজোরে টেনে তার সুকোমল বুকে জাপটে ধরলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালাম।

তার এ ভরা যৌবনের উষ্ণ আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না।

আমি হারিয়ে গেলাম।

ভোরে ঘুম থেকে উঠে বিছানার অগোছালো অবস্থা দেখে লজ্জিত হলাম। গোসল সেরে নাশতার টেবিলে গেলাম।

চম্পা মিটি মিটি হাসছে।

তার দিকে তাকাতে পারলাম না। চা-নাশতা খেয়ে সোজা জিপে উঠলাম।

লক্ষ্য করলাম পেছনে পেছনে চম্পাও এলো, হাতজোড় করে অভিবাদন করলো এবং জিপটি দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত সেখানে ঠায় দাড়িয়ে রইলো।

আমার ভ্রমণ কাহিনী এখানে শেষ হতে পারতো। কিন্তু তা হলো না।

কিছুকাল পরে আমার ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেল। পাস করে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। এর কিছুদিনে মধ্যেই আমার বিয়ে হয়। ছেলেমেয়েরা সবাই লেখাপড়ায় খুবই ভালো।

১৯৮৬ সালে বদলি হয়ে চট্টগ্রাম আসি। প্রায় একই সময়ে আমার এক পরিচিত ভাই সামসুদ্দিন আহাম্মদ তৎকালীন চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পৃন্সিপাল পদে যোগদান করেন। চট্টগ্রামে দিনগুলো ভালোই কাটছিল। মি. আহাম্মদ একদিন আমাকে টেলিফোন করে এক আশ্চর্য খবর দেন। তিনি জানালেন, ঠিক আমার চেহারার মতো একটি ছেলে তার কলেজে পড়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে গেলাম। ছেলেটিকে ডাকা হলো। তাকে দেখে আমিও অবাক হলাম। হ্যা। দেখতে অবিকল আমারই মতো!

সে জানালো, তার নাম হারাধন, তার মায়ের নাম চম্পা, তাদের বাসা রশীদপুর টি এস্টেটের বস্তিতে এবং তার মা বছর দুয়েক আগে মারা গেছে।

তার বক্তব্য শুনে আমার ভেতরটা মোচড় খেল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমার চারপাশের সব কিছু যেন ঘুরছে। কোনো রকমে গাড়িতে উঠে বাসায় চলে এলাম। আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না।

কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কাউকে কিছু না বলে কক্সবাজার গেলাম। কিন্তু আমার মনের অস্থিরতা কমলো না এবং কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারলাম না।

অবশেষে বাসায় ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলাম।

সে বিষয়টি বুঝলো।

তার এই সহনশীল মনোভাবে স্বস্তি পেলাম। ভোরে উঠেই গেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কিন্তু হারাধনকে পাওয়া গেল না। সে তিন দিন আগেই হস্টেল ছেড়ে বিদেশে চলে গেছে এবং বলে গেছে, তাকে খোজাখুজি করে কোনো লাভ হবে না। কেউ আর তাকে খুজে পাবে না।

তারপর গেলাম শ্রীমঙ্গল। বাবুর্চির সঙ্গে আলাপ হলো। জানতে পারলাম, চম্পা চেয়েছিল ছেলেকে পড়াশোনা করাবে এবং বাবুজি বানাবে। ছেলেটি লেখাপড়ায় ভালোই ছিল। কিন্তু আফসোস চম্পা তার শেষ দেখে যেতে পারলো না। আরো বললো, ছেলেটি তার জন্ম বৃত্তান্ত জানতো এবং বাবুজিকে সে অত্যন্ত ঘৃণা করতো তাই সে কোনোদিন বাবুজিকে খোজ করেনি।

পরাজিত সৈনিকের মতো মাথা হেট করে চলে এলাম।

বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে খুজে নিরাশ হয়েছি। তারপর বহুদিন চলে গেছে। এখন অবসর জীবনযাপন করছি। এখনো তাকে ভুলতে পারিনি। এমনি একদিন যায়যায়দিনে চা বিষয়ে লেখার আহ্বানটি দেখলাম এবং এক বসায় আমার এ কাহিনীটি লিখে ফেললাম।

বিদেশে যায়যায়দিন প্রায় সব বাংলাদেশিই পড়ে। আমার বিশ্বাস, হারাধনও হয়তো পড়বে এবং আমার অবস্থান জানবে, আমাকে ক্ষমা করবে। জীবনের এই শেষপ্রান্তে একবারের জন্য হলেও আমাকে দেখা দেবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

তিন বোন

– মোহাম্মদ আবদুল্লাহ–আল–মামুন

চা পান করার অভ্যাস মোটেও ছিল না। তবুও এই চা পান করাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমার ভালোবাসা। ঘটনাটি খুলেই বলি।

আমার বন্ধু শাহ আলম একদিন খুব জোর করে তাদের বাসার নিয়ে গেল। বাসায় তার মা ও তিন বোন ছিল। পরিচয়ে জানতে পারলাম, বড়টির নাম রোজিনা, বয়স আঠারো, মেজটি পান্না, বয়স ষোল এবং ছোটটি ঝরনা বয়স চোদ্দ।

তিনজনই ক্যারম খেলায় মশগুল ছিল। আমাকে তারা খেলার জন্য ডাকলো।

আমি ক্যারম খেলায় পটু। তাই না করতে পারলাম না।

খেলা শুরু হলো। গেম খেলবে জোড়া–জোড়ায়। রোজিনা, পান্না এক দলে এবং আমিও ঝরনা আরেক দলে। খেলা তিন হিটের বেশি গড়ালো না। ফলাফল, আমরা তাদের নিল (Nil)-এ হারিয়েছি। খেলায় আমার এতো হাতপাকা দেখে ওরা প্রশংসা করতে লাগলো।

এই ফাকে গণি নামের আমাদের আরেক বন্ধু এলো। এ বন্ধুটাও খেলায় এক্সপার্ট।

তাই পান্না ওকে জুটি করে নিয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলো।

খেলা শুরু হলো। তবে এবার গেম নয়, কলাগাছ।

এর মধ্যে রোাজিনাকে চা-বিস্কিটের বন্দোবস্ত করতে বললেন খালাম্মা।

রোজিনা চলে গেল।

খেলা চলছে তো চলছেই।

এক পর্যায়ে আমাদের কাছে রইলো মাত্র পনেরো। পরেরবার আরো বিপর্যয়, পেলাম দশ।

এর মধ্যে রোজিনা চা সবার হাতে তুলে দিচ্ছে এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে ঝরনাকে বললো, কি রে পাকা খেলোয়াড়ের দল, এবার তো তোদের বারোটা বাজছে।

ঝরনাও কম যায় না। বললো, দাড়া একটু চা-টা খেয়ে নিই, তারপর দেখাচ্ছি।

আমি চুপ, নিজেদের এমন অবস্থার জন্য। হাতি খাদে পড়লে সবাই লাথি মারে। আমার অবস্থাটাও সেই রকম।

রোজিনা আমাকে চা এগিয়ে দিল।

আমি চা নেয়ার জন্য রোজিনার দিকে মুখ তুলে চাইলাম। বাহ! কি সুন্দর। মানুষ যে এতো সুন্দর হতে পারে তা আমার জানা ছিল না। তার দিকে এক পলক চেয়ে রইলাম। সেও আমার দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইলো। খানিক বাদে রোজিনা দৃষ্টি নামিয়ে বললো, খেলেন, আপনার দান এসেছে।

আমি হুশ হয়ে স্টিক হাতে তুলে নিলাম।

এর মাঝে ঝরনা বলে ফেললো, ভাইয়া, আপনার মন কোথায় হারিয়ে গেল? এই কারণে বোধহয় আমরা হারার পথে?

তার কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

এতে আমি কিছুটা লজ্জিত হলাম।

যাক, দশ দিয়ে খেলা শুরু করলাম। এই বোর্ডে পেলাম বিশ। পরেরটায় ত্রিশ, তারপর পঞ্চাশ, এরপর আশি। এভাবে শেষমেশ খেলাটা আমরাই জিতলাম।

সেদিন খালাম্মা আমাকে না খেয়ে আসতে দিলেন না। ঝরনা তো পারলে রেখেই দেয়।

তার মিশুক আচরণের জন্য ভালো লাগলো। পছন্দ হলো তাকে। কিন্তু বলিনি।

এরপর মাঝে মধ্যেই শাহ আলমের বাসায় চলে যেতাম। কিন্তু কোনোদিন রোজিনার সঙ্গে কথা হয়নি, শুধুই চোখাচোখি, বাকা ঠোটে মুচকি হাসি। চা অবশ্য প্রতিবারই খাওয়া হতো। কিন্তু তার এই রহস্য উদঘাটন করতে পারিনি।

এরপর অনেক দিনের বিরতি দিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুর বাসায় গেলাম। অনেকক্ষণ থাকলাম, চা-বিস্কিট খেলাম। কিন্তু রোজিনাকে দেখলাম না। পান্নাকে বললাম, ও কোথায়?

আপার তো বিয়ে হয়ে গেছে।

থতমত খেলাম। পান্না আমাকে একটি ছোট চিরকুট ধরিয়ে দিল, বললো, আপা দিতে বলেছেন।

দেখলাম তাতে লেখা, *ভালোবাসা আমার, ক্ষমা করো।*

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাসায় চলে এলাম। ভাবলাম, মেয়েরা এতো চাপা স্বভাবের, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। সে আমাকে ভালোবাসতো, অথচ আমি জানতে পারিনি।

এরপর ছয় মাস হবে তাদের বাসায় যাইনি।

চাকরি পাওয়ার সুবাদে একদিন মিষ্টি নিয়ে গেলাম। দেখি বাড়িঘর ফাকা। শাহ আলমকে পেলাম না। খালাম্মা ও ঝরনা আছে। কিছুক্ষণ আলাপ হলো।

খালাম্মা চা আনতে চলে গেলেন।

ঝরনা আমার হাতে একটি খাম তুলে দিল।

খাম খুলে ভেতরের কাগজে দেখি লেখা, *তোমার পান্নাকে ক্ষমা করে দিও*।

বুঝলাম না, ঝরনাকে বললাম।

সে বললো, ভাইয়া, পান্নাআপু আপনাকে ভালোবাসতো। কিন্তু নিয়তির পরিহাস তার বিয়ে হয়ে গেছে দেড় মাস।

খালাম্মা চা দিলেন।

কিন্তু পান করতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না। খালাম্মা চলে গেলে ঝরনা আবারও বলা শুরু করলো।

আসলে আমরা তিন বোনই মনে-প্রাণে আপনাকে পছন্দ করতাম। অবশ্য আমি আপনাকে ভালোবাসি বেশি। কিন্তু বোনদের জন্য বলিনি। আপনার প্রসঙ্গে এতোটাই গভীর হয়ে ভাবতাম, নিজেদের অন্য কাজে মন বসতো না। যাহোক, আমি আপনাকে চিরকুট দেবো না। আমি আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে ধরে রাখবো চিরকাল। এই বলে সে আমাকে জাপটে ধরলো।

আশ্চর্য হলাম তার সাহস দেখে এবং নতি স্বীকার করলাম তার ভালোবাসার বিশ্বাসের কাছে। অবশ্য এর প্রতি আমি অনেকটা দুর্বল। তাই নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। বললাম, খালাম্মা আছেন?

সে বললো, না পাশের বাসায় গেছেন।

ঝরনাকে খুব জোরে জাপটে ধরলাম। তারপর সমস্ত অঙ্গে চুমুতে চুমুতে তাকে ভালোবাসায় অস্থির করে তুললাম। ভালোবাসায় এতো জাদু তা আগে জানা ছিল না। অবশেষে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

এ সময় দেখি তার চোখে অশ্রু। বললাম, কি হয়েছে?

বুকের মধ্যে মাথা রেখে বললো, কথা দাও, কখনো ভুলে যাবে না, এভাবে চিরকাল ভালোবেসে যাবে।

তার দুটি হাত ধরে আশ্বস্ত করলাম।

ঝরনা বললো, এবার তাহলে এক কাপ চা করে দিই?

আমি দুষ্টু হাসির বাকে মিষ্টি করে বললাম, না, দুই কাপ দাও।

করাতিটোলা, সায়েদাবাদ, ঢাকা থেকে

এক কাপ চা

– ক্যাথরিন ম্যান্সফিল্ড

রোজমেরি ফিল, সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তা তিনি নন। না, তাকে সুন্দরী বলা যাবে না। সুশ্রী? আচ্ছা, তার সব কিছু যদি ভেঙে ভেঙে দেখা হয়...। কিন্তু একজন মানুষকে ভেঙে টুকরো করার মতো নির্দয় হবো কেন আমরা? অল্প বয়সী, বুদ্ধিমতি, দুর্দান্ত আধুনিক, চমৎকার পোশাকে মার্জিত, নিত্যনতুন বইয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা তুখোড় সচেতন পাঠক প্রভৃতি অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটে তার পার্টিতে...শিল্পী, নান্দনিকতার স্রষ্টা, অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি নন যাদের কিছু বর্ণনায় ভাষার অতীত। কিন্তু বাকিরা সবাই দারুণ চমৎকার এবং সঙ্গী হিসেবে উপভোগ্য।

রোজমেরি বিয়ে করেছে দুই বছর আগে। বিয়ের আগে তার এক প্রেমিক ছিল। না, পিটার মাইকেল নয়। রোজমেরি-কে তার স্বামী ভীষণ ভালোবাসেন। তারা অনেক ধনী, আসল ধনী বলতে যা বোঝায় তাই। শুধু

স্বচ্ছন্দে চলার মতো অর্থ নয়, বরং উপচে পড়া প্রাচুর্য আর অঢেল টাকায় তারা এমন পূর্ণ ছিল যা শুনে দাদা–দাদির আমলের কথা মনে পড়ে।

রোজমেরি–র যখন শপিং করার ইচ্ছা হয় তখন সে প্যারিস যায়, আমরা যেমন বন্ড স্ট্রিটে যাই। যদি ফুল কিনতে চায় তাহলে রিজেন্ট স্ট্রিটে ফুলের দোকানের সামনে গাড়ি থামায়, এক ঝলক দেখে নেয় দোকানের সবগুলো ফুল। তারপর হালকাভাবে বলে, আমি ওটা নেবো, ওটা নেবো, আর ওটা। আমাকে ওই ফুলগুলো দিন চার গোছা এবং গোলাপের এই ফুলদানিটি। হ্যা, আমি ফুলদানির সবগুলো গোলাপ নেবো। না, না, লাইলাক নেবো না, এগুলোর কোনো আকৃতি নেই।

দোকানের বিক্রেতা তখন এতো দ্রুত লাইলাকগুলো সামনে থেকে সরিয়ে ফেলবে যেন রোজমেরির বাহনটি একমাত্র সত্য পৃথিবীতে, লাইলাক প্রকৃতই কোনো আকৃতিহীন ফুল বিশেষ।

আমাকে ওই ছোট্ট টিউলিপগুলো দিন। সঙ্গে লাল আর শাদা ফুলগুলোও দেবেন।

এভাবে ফুল কেনা শেষ হওয়ার পর দোকানের মেয়েটি শাদা কাগজে মোড়ানো ফুলগুলো খুব সাবধানে কোলে করে এমনভাবে রোজমেরির পেছনে গাড়ি পর্যন্ত আসবে, দেখে মনে হবে বড় কাপড়ে প্যাচানো ছোট একটি বাচ্চা...।

একদিন শীতের বিকেলে রোজমেরি কার্জন স্ট্রিটে একটি অ্যান্টিক শপে গিয়েছে। এই দোকানটি তার বিশেষ পছন্দের। রোজমেরির সেবা করতে পারলে দোকানের সেলসম্যান ধন্য হয়ে যেতো। রোজমেরি শপে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেলসম্যান ছুটে আসেন হাত তালি দিয়ে, এতোই বিগলিত হাসি ফোটায় মুখে যে অতি আবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়। যা কথা বলে সবই খুব নিচু স্বরে। কান পেতেও শুনতে পাবে না তৃতীয়জন। তোষামোদি অবশ্যই।

সবখানে এক অবস্থা, ব্যবসায়ীদের কিছু চিরাচরিত বৈশিষ্ট আছে...।

আপনি দেখুন ম্যাডাম। শ্রদ্ধামাখা নিচু কণ্ঠস্বরে সেলসম্যানটি এবার বলবে আমার দোকানের সব জিনিস হচ্ছে আমার ভালোবাসা। কেউ যদি এগুলো দেখে মুগ্ধ না হয়, প্রশংসা না করে তাহলে কারো কাছে আমি এদের বিক্রি করে নিজের থেকে আলাদা করতে পারবো না। আমার জিনিসের মতো এমন মসৃণ, নিখুত উপলব্ধি নেই যাদের...। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গ্লাস কাউন্টারের ওপরে নীল মখমল কাপড়টি একবার খুলে আবার ছেড়ে দেবে তার আঙুলের ফ্যাকাশে ডগা দিয়ে।

আজ সে একটি ছোট্ট বাক্স দেখালো। বাক্সটি রোজমেরির জন্য সেলসম্যান রেখেছিল অন্য কাউকে দেখায়নি পর্যন্ত। মিনা করা দুর্লভ একটি বাক্স, চমৎকার পলিশ করা, মনে হয় যেন বাক্সটিকে কৃমের গোলায় চুবিয়ে তুলে এনেছে। কোণায় ফুল ভরা গাছের নিচে একটি ছোট্ট পরী দাড়িয়ে আছে, তার ঘাড়ের ওপর আরো ক্ষুদে কিছু সখী হাসছে। পরীর মাথার টুপিটি জেরেনিয়াম ফুলের পাপড়ি থেকে বড় হবে না। সেটিতে আবার সবুজ ফিতা বাধা। সবার মাথার ওপর গোলাপি মেঘ ভেসে যাচ্ছে তুলার মতো।

এ ধরনের কিছু দেখার সময় রোজমেরি হাত থেকে গ্লাভস খুলে নেয় আগে। এখনো সে লম্বা গ্লাভস থেকে তার সুন্দর হাত দুটো বের করলো। এই বাক্সটি তার খুবই পছন্দ হয়েছে। এটা তার কিনতে হবে। মসৃণ পেলব বাক্সটি হাতে নিয়ে একবার ঢাকনা খুলে আবার বন্ধ করে রাখলো। প্রতিবার একটি বিষয় লক্ষ্য না করে পারে না, দোকানের কাচে বিছানো নীল মখমলের ওপর তার আঙুলগুলো কি অপূর্ব সুন্দর লাগে!

কাউন্টারের বুকে পেন্সিলে কিছু লিখতে লিখতে রোজমেরি–কে উদ্দেশ্য করে সেলসম্যান বললো, ম্যাডাম, মহিলাদের গায়ের ফুলগুলো দেখেছেন?

অপূর্ব! ফুলের প্রশংসা করে রোজমেরি। কিন্তু এর দাম কতো?

সেলসম্যান মনে হলো কিছুক্ষণের জন্য কানে শুনলো। তারপর চাপা স্বর শোনা গেল। আটাশ গিনি ম্যাডাম।

আটাশ গিনি। কোনো কথা বললো না রোজমেরি।

নিঃশব্দে বাক্সটি নামিয়ে রেখে গ্লাভস পরলো হাতে। আটাশ গিনি। কেউ যদি অতিরিক্ত ধনীও হয়...। অর্থশূন্য দৃষ্টিতে রোজমেরি দোকানদারের মাথার ওপর দিয়ে মুরগির মতো একটি চায়ের কেটলির দিকে তাকিয়ে আছে। শোকেসের ওপর চোখ রেখে অনেকক্ষণ পর কথা বললো। কণ্ঠস্বর যেন উড়ে এলো স্বপ্নের ভেতর দিয়ে, ঠিক আছে, বাক্সটা আমার জন্য রেখে দিন। রাখবেন তো? আমি...।

সেলসম্যান অনেক আগেই বাক্সটি রোজমেরির জন্য রাখবে বলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল যেন পৃথিবীতে যে কোনো মানুষেরই উচিত তাই করা। অবশ্যই সে রোজমেরির জন্য বাক্সটি রাখবে, প্রয়োজন হলে চিরকাল রেখে দেবে।

দোকানের দরজা পেছনে বন্ধ। রোজমেরি দোকানের বাইরে দাড়িয়ে শীতের বিকেল দেখছিল। অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টির সঙ্গে অন্ধকারও জুটেছে। পোড়া ছাইয়ের মতো ধূসর অন্ধকার ছেয়ে ফেলতে চাইছে গোটা শহর। বাতাসে শীতল তিক্ততা, নতুন জ্বালানো লাইটের আলোও কেমন বিষণ্ন। বিষণ্ন আলো জ্বলছে রাস্তার পাশের ঘরগুলোতে, নিভু নিভু শিখায় তারা যেন ভর্ৎসনা করছে সবাইকে। হঠাৎ রোজমেরি যন্ত্রণা বোধ করে। দুই হাত বুকের সঙ্গে চেপে ধরলো। মনে মনে বললো, বাক্সটি তার চাই-ই চাই। সামনে গাড়ি দাড়িয়ে আছে। শুধু রাস্তাটুকু পার হওয়া। কিন্তু রোজমেরি নড়ে না, বিহ্বল দৃষ্টি বাড়িয়ে তাকিয়ে থাকে শূন্যে।

আমাদের জীবনে কিছু সময় আসে, এমন দৈব সংকেতময় কিছু মুহূর্ত আসে যখন মানুষ তার নিরাপদ আকাশ ছেড়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে দাড়ায়। নতুন করে দেখে চিরচেনা জীবনটাকে। অভূতপূর্ব সেই মুহূর্তে কেউ কেউ লাটাইয়ের সুতো ছাড়ে অনেক দূর পর্যন্ত উড়িয়ে আনে নবভাবনার রঙিন ঘুড়িটি আবার কেউ শংকিত মনে দ্রুত ভাবে বাড়ি গিয়ে কড়া করে এক কাপ চা খেতে হবে! আমাদের নায়িকা রোজমেরি এসবের কিছুই ভাবার সময় পায় না। অল্প বয়সী, রোগা-পাতলা এক মেয়ে এসে দাড়িয়েছে সামনে, কোথা থেকে এলো সে?

রোজমেরির কনুইয়ের কাছে দাড়িয়ে কাকভেজা কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললো, ম্যাডাম, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?

আমার সঙ্গে কথা বলবে? ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এলো। রোজমেরি দেখল, উৎসুক চোখে অল্প বয়সী একটি মেয়ে দাড়িয়ে আছে ওর সামনে, বয়সে কোনোভাবেই তার চেয়ে বড় হবে না। মেয়েটি দুই হাতে শার্টের কলার চেপে ধরে আছে আর শরীর হালকা কাপছে যেন পানি থেকে উঠে এসেছে এই মাত্র।

ম্যাডাম, কাপা কণ্ঠে বিনীত আবেদন। দয়া করে আমাকে এক কাপ চায়ের দাম দেবেন?

এক কাপ চা? মেয়েটির কণ্ঠে খুব সরল বেদনার্ত আর্তি ছিল। ভিক্ষুকদের কণ্ঠস্বর এমন হয় না। রোজমেরি প্রশ্ন করলো, তার মানে তোমার কাছে কোনো টাকা নেই?

না ম্যাডাম।

গোধূলির খোলা আকাশে তাকিয়ে রোজমেরি ভাবে, কি আশ্চর্য!

মেয়েটি উত্তর না জানা ভয়ে তাকিয়ে আছে রোজমেরির মুখের ওপর।

কি অদ্ভুত কথা! হঠাৎ রোজমেরির মাথায় অন্য রকম এক চিন্তা এলো। গোধূলির পরিচয়ে সে এমন কিছু ঘটাতে যাচ্ছে যা শুধু দস্তয়েভস্কির কোনো উপন্যাসেই সম্ভব। ভাবছে রোজমেরি, মেয়েটিকে তার বাড়ি নিয়ে যাবে কি না? আসলে রোজমেরি তখন এমন কিছু ভাবছিল যা সে বইয়ে পড়েছে বা নাটকে দেখেছে এতো দিন। তেমন কিছু করলে কেমন হয়? অবশ্যই খুব রোমাঞ্চ, খুব রোমাঞ্চকর হবে ব্যাপারটি।

দোকানের সামনে দাড়িয়ে বিষণ্ন সন্ধ্যাকে সাক্ষী রেখে রোজমেরি যেন স্পষ্ট শুনলো বান্ধবীদের কাছে গল্প বলছে, মেয়েটিকে সোজা আমার সঙ্গে বাড়িতে নিয়ে এলাম এবং সামনের লজ্জাবনত মেয়েটিকে রোজমেরি তখন সত্যি সত্যি বললো, আমার বাড়িতে চলো, চা খাবে।

মেয়েটি এবার চোখ নামিয়ে নিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার শরীরের কাপুনি বন্ধ হয়ে গেছে।

রোজমেরি মেয়েটিকে হালকা ছুয়ে বললো, সত্যি বলছি।

তারপর খুব সহজভাবে মিষ্টি করে হাসলো।

নিজে না দেখলেও রোজমেরি বুঝতে পারে তার এই হাসিটি কতো স্বাভাবিক আর স্নেহপূর্ণ ছিল।

কেন যাবে না? আমার সঙ্গে গাড়ি করে চলো, এক কাপ চা খেয়ে আসবে।

আপনি, আপনি সত্যি বলছেন না ম্যাডাম। কান্না চলে এসেছে মেয়েটির কণ্ঠে।

আমি সত্যি বলছি তোমাকে। রোজমেরি বললো, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো। আমাকে খুশি করো। এসো।

ঠোটের ওপর আঙুল রেখে মেয়েটি কিছু ভাবলো। তার চোখ জোড়ায় সন্দেহ। আপনি, আপনি আমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে যাবেন না তো?

পুলিশের কাছে? রোজমেরি হেসে ফেললো। কেন এতো নিষ্ঠুর হবো আমি? না। আমি শুধু তোমাকে একটু আনন্দ দিতে চাই। তারপর তোমার সব কথা শুনবো।

ক্ষুধার্ত মানুষ সহজে বধ্য। ড্রাইভার গাড়ির দরোজা খুলে ধরলো এবং পর মুহূর্তে তারা দুজন গোধূলিতে হারিয়ে গেল।

এসো। রোজমেরি ডাকে। মখমলের পাতলা চাদর হাতের তালুতে পিছলে গেলে যেমন অনুভূতি হয়, রোজমেরির এখন কেমন লাগছে। মেয়েটিকে সে বলতে পারতো, এই তো, আমার সব কথা শুনছো। অবশ্য কথাটি সে উদার মনেই বলতো। না, উদারতার চেয়েও বেশি কিছু থাকতো কণ্ঠে। রোজমেরি আজ মেয়েটিকে প্রমাণ করবে, অসম্ভব সুন্দর ঘটনাগুলো জীবনেও ঘটে। যে রূপকথার দেবীরা সত্যি ছিল, যে ধনী লোকদেরও হৃদয় থাকে এবং বোঝাবো যে, মেয়েরা পরস্পর বোন হয়। হালকা কণ্ঠে বললো, ভয় পেও না। বলো তো কেন আসতে চাওনি তুমি আমার সঙ্গে? আমরা দুজনই মেয়ে। আমার ভাগ্য যদি বেশি ভালো হয় তাহলে তোমার অধিকার আছে...।

কিন্তু বাক্যটি শেষ করতে পারে না রোজমেরি। তারা পৌছে গেছে। গাড়ি থামলো। বেল বাজলো। বাড়ির প্রধান দরজা খুলে গেছে, ভেতরে পরিপাটি সুন্দর করে সাজানো ঘর দেখা যাচ্ছে।

রোজমেরি মেয়েটাকে ড্রয়িংরুমে বসালো। উষ্ণ কোমল উজ্জ্বলতা পুরো বাড়িতে। মিষ্টি একটি গন্ধ ভাসছে বাতাসে। এই বাড়ির সব কিছু রোজমেরির এতো পরিচিত, কখনো এগুলো বিশেষভাবে দেখার কথা মনে হয়নি। আজ তার ঐশ্বর্য দেখে মেয়েটির ভড়কে যাওয়া মুখের ছবি উপভোগ করে রোজমেরি। মনে হচ্ছে আজ সে বাচ্চা একটি মেয়ের মতো আনন্দিত যে অদেখা সবগুলো গুপ্তধনের ভাণ্ডার খুলবে নিজ হাতে।

এসো, উপরে এসো। মনের উদারতার সর্বোত্তম পরিচয় দিতে মেয়েটিকে ডাকে রোজমেরি, আমার ঘরে চলো। তাছাড়া সে চাচ্ছিল না বাড়ির কাজের লোক এসে এই মেয়েটির কোনো সেবা করুক, বরং রোজমেরি নিজে সব জিনিস নিয়ে সিড়ি বেয়ে উঠবে মেয়েটির সঙ্গে। মহৎ কিছু সহজভাবে ঘটতে হয়।

রোজমেরির সুন্দর সুবিশাল শোবার ঘরে নিয়ে এলো মেয়েটিকে। ঘরে দামি পর্দা, ফার্নিচারগুলো আলোয় ঝলমল করছে, সোনার কুশন, ফুলদানিতে প্রাইম রোজ আর বিছানার ওপর নীল কম্বল।

ঘরের ভেতরে এক পা দিয়ে দরজাতেই দাড়িয়ে থাকে মেয়েটি। একদম জমে গেছে যেন।

অবশ্য রোজমেরি তাতে মাইন্ড করে না।

এসো, বসো। ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে একটি বড় চেয়ার টেনে বললো রোজমেরি। এসো, একটু গরম হও। তোমার মনে হয় ঠাণ্ডা লাগছে।

আমি পারবো না ম্যাডাম। বলে মেয়েটি পেছনে সরে যেতে চাইলো।

ওহ প্লিজ! রোজমেরি দৌড়ে যায়, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই। সত্যি বলছি, এখানে বসে আরাম করো। আমার হাতের জিনিসগুলো রেখেই পাশের ঘরে যাবো আমরা। চা খাবো এবং তোমার কথা শুনবো। তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? বলে মেয়েটির কাধে আলতো চাপ দিয়ে সোফায় বসিয়ে দিল।

মেয়েটি কোনো কথা বললো না। পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে আছে সোফায়। মুখ সামান্য খোলা। অতিরিক্ত মনোযোগী হতে গিয়ে তাকে কেমন বোকা লাগছে।

রোজমেরি এসব খেয়াল করে না। বললো, তুমি টুপি খুলবে না? তোমার সুন্দর চুলগুলো সব ভিজে গেছে। তাছাড়া টুপি খুলে থাকলে তো বেশি আরাম হয়, তাই না?

ফিশফিশ কণ্ঠে একটি বাক্য শোনা গেল যার অর্থ আচ্ছা ম্যাডাম।

মেয়েটির মাথার ছেড়া টুপি খুলে দিল রোজমেরি।

এসো, তোমার কোটটিও খুলে দিই।

কোট খোলার জন্য মেয়েটি উঠে দাড়ালো সোফা থেকে। কিন্তু শক্ত হয়ে এক হাতে সোফার হাতল ধরে রাখলো।

অনেক কষ্টে রোজমেরি কোটটি খুললো। কোট খুলতে তার অনেক পরিশ্রম হয়েছে। কারণ মেয়েটি কাঠের পুতুলের মতো দাড়িয়ে ছিল। রোজমেরি মনে মনে ভাবলো, কেউ যদি চায় অন্যরা তাকে সাহায্য করুক তাহলে তারও উচিত সেখানে কিছুটা সাহায্য করা। না হলে পুরো বিষয়টি সত্যি কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন এই কোটটি সে কি করে? একটু ভেবে কোট এবং টুপি দুটোই ফেলে রাখলো মেঝেতে।

একটি সিগারেট ধরাবে? বললো রোজমেরি।

তক্ষুনি মেয়েটি অস্পষ্টভাবে বললো, খুব দুঃখিত ম্যাডাম, এখন ফেইন্ট হয়ে যাবো। এই মুহূর্তে কিছু না খেলে মারা যাবো আমি।

মাই গড! কি নির্বোধ আমি। দৌড়ে বেল বাজালো রোজমেরি।

চা, চা আনো এক্ষুনি। আর শোনো, ব্র্যান্ডি আনো জলদি।

মেয়েটি চিৎকার করে, না, আমি ব্র্যান্ডি চাই না। আমি ব্র্যান্ডি খাই না। আমি শুধু এক কাপ চা চাই ম্যাডাম। বলতে বলতে হাউমাউ করে কেদে ফেললো।

বীভৎস এক মুহূর্ত। রোজমেরি ঝুকে বসলো সোফার ওপর।

কাদে না, বোকা মেয়ে। কাদছো কেন? নিজের রুমাল বাড়িয়ে দিল রোজমেরি। কিন্তু কোনো কথাতেই ফোপানি আর থামছে না দেখে রোজমেরি মেয়েটির পাখির মতো পাতলা কাধ জড়িয়ে ধরলো।

রোজমেরি আন্তরিকতার ছোয়ায় মেয়েটা এবার অনেকখানি আশ্বস্ত হলো। বললো, আমি এখানে আর থাকতে পারবো না। আমার সহ্য হচ্ছে না। সহ্য করতে পারছি না এসব। এখান থেকে একা চলে যাবো। একদম সহ্য করতে পারছি না।

তোমার যেতে হবে না। আমি তোমার দিকে খেয়াল রাখবো। কেদো না। তোমার কি মনে হচ্ছে না, আজ আমার সঙ্গে দেখা হয়ে কতো ভালো হয়েছে? আচ্ছা, এখন চা খাও। তারপর সব কথা খুলে বলো আমাকে। কথা দিচ্ছি, তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা করবো। কান্না থামাও। কান্না খুব বিরক্তিকর লাগে। প্লিজ!

রোজমেরি নিজে উঠে গিয়ে টেবিল টেনে আনলো। তাদের দুজনের মাঝখানে ছোট টেবিলটি রেখে অনেক খাবারের স্তূপ করে ফেললো টেবিলের ওপর। সব কয়টি স্যান্ডউইচ খাওয়ালো মেয়েটাকে। যতোবার কাপ খালি হলো, ততোবার চা ক্রিম চিনি দিয়ে কাপ ভরে দিল। সবাই বলে, চিনি মানব দেহের জন্য উপকারী। রোজমেরি নিজে কিছু খেলো না, সিগারেট জ্বালিয়ে সাবধানে তাকিয়ে দেখছিল মেয়েটাকে যাতে বেচারী আবার তাকানো দেখে লজ্জা না পায়।

সামান্য খাবারটুকুতেই দারুণ কাজ হলো। খাওয়া শেষ হবার পর দুর্বল মেয়েটি তার ঘন চুল, গা, ঠোট আর গভীর চোখ দুটো নিয়ে একেবারে ভিন্ন চেহারা ফিরে পেয়েছো যেন। সোফায় হেলান দিয়ে ফায়ারপ্লেসের উজ্জ্বল আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে এখন এক মনে। নতুন একটি সিগারেট ধরালো রোজমেরি, এখন কথা শুরু করবে সে।

লাস্ট কখন খেয়েছিলে? নরম কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রোজমেরি।

কিন্তু উত্তর শোনার আগেই দরজা খুলে গেল।

রোজমেরি, ভেতরে আসবো?

ফিলিপ এসেছে।

নিশ্চয়ই।

ভেতরে এসে ফিলিপ বললো, আমি খুব সরি। তারপর চুপ করে দাড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

কোনো অসুবিধা নেই। হেসে বলে রোজমেরি, ও হচ্ছে আমার বন্ধু। মিস...

স্মিথ ম্যাডাম, দুর্বল কণ্ঠে জানায় মেয়েটি। সে এখন আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তার চোখ–মুখ ভয়শূন্য।

স্মিথ। রোজমেরি বলে, আমরা একটু গল্প করছিলাম ফিলিপ।

ও হ্যা নিশ্চয়ই। বলে ফিলিপ মেঝেতে পড়ে থাকা কোট আর টুপিটি দেখলো। ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে ঘুরে দাড়ায়। বলে আজকের সন্ধ্যাটা জঘন্য। নিজের হাত আর জুতার দিকে চোখ রেখে মাথা নিচু করে থাকা মেয়েটিকে দেখলো একবার, তারপর রোজমেরির সঙ্গে চোখ মেলালো আবার।

হ্যা, ভীষণ বাজে আবহাওয়া।

ফিলিপ তার মিষ্টি হাসিটি হাসলো। একটি কথা আছে, তুমি কি একটু লাইব্রেরিতে আসবে আমার সঙ্গে? মিস স্মিথ যদি আমাদের অনুমতি দিতেন...।

গভীর চোখ জোড়া পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় ফিলিপের দিকে।

কিন্তু কিছু বলার আগেই রোজমেরি হেসে বললো, অবশ্যই তিনি অনুমতি দেবেন। তারপর দুজন এক সঙ্গে বেরিয়ে গেল শোবার ঘর থেকে।

লাইব্রেরিতে গিয়ে ফিলিপ প্রশ্ন করলো, মেয়েটি কে বলো তো? এসবের মানে কি?

রোজমেরি শুধু হাসে। লাইব্রেরির দরজায় হেলান দিয়ে বললো, ওকে আমি কার্জন স্ট্রিট থেকে তুলে এনেছি। সত্যি, কঠিন জিনিস। মেয়েটি রাস্তায় আমার কাছে এসে এক কাপ চায়ের দাম চাইলো। আমি তাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছি।

তাকে নিয়ে কি করতে চাও তুমি? ফিলিপ প্রশ্ন করে।

ওর জন্য কিছু করতে চাই। দ্রুত বলে রোজমেরি। ভালো একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তার দেখাশোনা করবো আমি। কিভাবে কি করবো ঠিক করিনি অবশ্য। এখনো কথা হয়নি মেয়েটির সঙ্গে। আগে তাকে দেখি কিছুক্ষণ, বোঝার চেষ্টা করি, জানি, তারপর...।

আমার সোনা মেয়েটা। ফিলিপ বললো, তুমি পাগল হয়েছো। এই মেয়েকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

আমি জানতাম তুমি এই কথাই বলবে। রেগে যায় রোজমেরি। কেন হবে না? আমি চাই, এটাই কি তার কিছু হবার জন্য যথেষ্ট কারণ নয়? তাছাড়া সবাই এসব ঘটনা শুধু বইয়ে পড়ে। আমি ঠিক করেছি...।

কিন্তু সিগারেটের মাথা হাতে ভেঙে হালকা সুরে বলে ফিলিপ, তার মুখটি আশ্চর্য রকম মায়াবী।

মায়াবী!

ফিলিপের মন্তব্য শুনে রোজমেরি এতো অবাক হলো যে পারলে তখনি ফেটে পড়তো। তোমার তা–ই মনে হয়? আমি– আমি এটা ভাবিনি।

কি বলো! ফশ করে একটি ম্যাচের কাটি জ্বাললো ফিলিপ। বললো, মেয়েটি দেখতে ভীষণ সুশ্রী। আবার গিয়ে দেখে এসো। তোমার ঘরে ঢুকে এই মাত্র আমি রূপের টানে ভেসে যাচ্ছিলাম। আরেকটু হলে। যাই হোক। আমি মনে করি একটি ভুল করে ফেলেছি। সরি ডার্লিং তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য। কিন্তু তুমি মিস স্মিথকে জিজ্ঞাসা করে এসো, সে আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খাবে কি না আর দি মিলিয়নেয়ার গেজেট পত্রিকাটিতে আমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছে কি না।

তুমি একটা অসম্ভব লোক। এই কথা বলে রোজমেরি লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এলো। কিন্তু শোবার ঘরে গেল না সরাসরি। রাইটিং রুমে ঢুকে চেয়ারে বসে থাকলো কিছুক্ষণ।

মায়াবী।

আশ্চর্য রকম সুশ্রী।

ভেসে যাচ্ছিলাম আরেকটু হলে।

রোজমেরির বুকে ভারী ঘণ্টা বাজে। মায়াবী। সুশ্রী।

চেক বই হাতে নিল রোজমেরি। না চেক বইয়ে লাভ হবে না। ড্রয়ার খুলে পাচটি পাউন্ড নিল হাতে, তারপর কি ভেবে দুটো নোট রেখে দিল আবার ড্রয়ারে। তিনটি পাউন্ড নোট হাতের মুঠিতে মুচড়ে শোবার ঘরের দিকে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পর রোজমেরি যখন লাইব্রেরিতে ফিরলো, ফিলিপ তখন বসে পেপার পড়ছে।

রোজমেরি এবারও দরজায় হেলান দিয়ে দাড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। দুষ্টু হাসি হেসে বললো, তোমাকে জানাতে এসেছি মিস স্মিথ আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খাচ্ছে না।

পেপার নামিয়ে ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলো, কেন, কি হয়েছে?

সে আজ ব্যস্ত?

ফিলিপের কাছে এসে হাটু ভেঙে বসলো রোজমেরি। বলে, মেয়েটিই চলে যেতে চাচ্ছিল। তাই আমি বেচারীকে কিছু পাউন্ড উপহার দিয়েছি। কারো থাকার ইচ্ছা না হলে আমি তো তাকে জোর করতে পারি না। তাই না?

লাইব্রেরিতে আসার আগে রোজমেরি চুল বেধেছে, চোখের কোল কাজল দিয়ে গাঢ় করেছে আর মুক্তার সেট পরেছে যত্ন করে। ফিলিপের হাটুতে এক হাত রেখে অন্য হাত ছোয়ায় গালে।

আমাকে ভালো লাগে তোমার? আবেগ জড়ানো ভারী কণ্ঠে প্রশ্ন করে রোজমেরি।

তোমাকে আমার দারুণ ভালো লাগে। রোজমেরিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ফিলিপ বললো, চুমু দাও।

তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা।

নীরবতা ভেঙে রোজমেরি গভীর কণ্ঠে আবার বললো, আজ বিকেলে আমি অ্যান্টিক শপে অদ্ভুত সুন্দর একটা বাক্স দেখেছি। আটাশ গিনি দাম। কিনবো?

নিচু হয়ে ঝুকে এগিয়ে গেল ফিলিপ রোজমেরির কাছাকাছি। অবশ্যই কিনবে। অল্প কিন্তু একটা বাজে খরচ হবে আর কি!

কিন্তু ওটা রোজমেরির আসল প্রশ্ন ছিল না।

ফিলিপ, নিজের বুকের সঙ্গে ফিলিপের মুখটি গভীর ভাবে আলিঙ্গন করে রোজমেরি ফিশফিশ করে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কি মায়াবী?

ভাষান্তর : লুনা রাহনুমা

উত্তর

– সৈয়দ হাবিব

আহা চায়ের কি স্বাদ
সে তো পরান জানে।
চায়ের পেয়ালা যদি সাগর হতো
আমি সাতার কাটতাম
তাতে মনের মতো।

এই সেই চা যা নিয়ে প্রতিদিন সকালবেলায় আমাদের পরিবারে আড্ডা বসতো। চায়ের সঙ্গে থাকতো নানান খাবার আর পুরনো দিনের সেই খড়ম বিস্কিট যা দেখতে ছিল অবিকল খড়মের মতো।

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমাদের পাশের বাড়ির এক ছেলের বৌ দেখতে গেছি কোনো এক গণ্ডগ্রামে। মিষ্টি, ফল–মূল অনেক কিছু খাওয়ার পর এলো চা অর্থাৎ চা পাতা জ্বাল দেয়ার পর পানি ফেলে দিয়ে পাতার সঙ্গে চিনি মিশিয়ে আমাদের পরিবেশন করা হলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি?

উত্তরে তারা বললো, চা।

বক্তারবাড়ি, নরসিংদী থেকে

চা বাগান

– মোহাম্মদ আবদুল মোমিত জুয়েল

ছোট্ট একটা শব্দ *চা*। শুনলেই অন্য রকম ভালো লাগার অনুভূতিতে আবেগ আপ্লুত হই। সুদীর্ঘকাল চা বাগানে আব্বার চাকরির সুবাদে সেই পাকিস্তান আমলের শেষ দিক থেকে আজ পর্যন্ত বলা চলে আমাদের প্রতিটা ভাইবোনের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় কেটেছে চা বাগানের নৈসর্গিক পরিবেশে। চায়ের চেয়ে চা বাগানের পরিবেশ আমাকে আকর্ষণ করতো বেশি। এই দীর্ঘ সময় চা বাগানে অবস্থানের কারণে স্মৃতির মণিকোঠায় এতো স্মৃতি পড়ে আছে যে লিখতে গেলে একটা বই লেখা যেতো। অকপটে স্বীকার করছি, সে রকম গুণাবলী আমার মধ্যে নেই।

প্রতি মাসে কম্পানির পক্ষ থেকে দুই পাউন্ড চা পাতা দেয়া হতো। আত্মীয়স্বজনদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ চা পেয়ে থাকি। তাই তাদের অলিখিত দাবি বলা চলে খাবার সময় বেশি পরিমাণে চা নেয়ার। পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে যোগ হয় আমাদের হাই স্কুলের শিক্ষকরা। যেহেতু একই সময় আমাদের কয়েকজন ভাইবোন হাই স্কুলে পড়তাম, এদিকটা মাথায় রেখে আম্মা তাদেরও খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে আমরা সবাই যখন হাই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে পাড়ি দিলাম তখনো এ ধারা অব্যাহত ছিল।

একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, আব্বা সচরাচর চা পান খেতেন না, এমনকি আমাদেরও চা খেতে নিরুৎসাহিত করতেন।

আব্বার সঙ্গে হালে যোগ দিয়েছেন আমাদের বড় বোন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকা থেকে দেশে এসেছিলেন বেড়াতে। তার কড়া অনুশাসন, চা, চিনি এগুলো শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই এসব না খেয়ে অন্য ভালো কিছু খাওয়ার চেষ্টা করো।

চা নিয়ে আরো কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার কথা মনে পড়ছে এ মুহূর্তে। আমাদের প্রতিবেশী এক কাকা মাঝে মধ্যে আমাদের বাসায় আসতেন। ওনার চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। কিন্তু কেউ চা দিয়ে আপ্যায়ন করালে না করতে পারেন না।

এ বছরের শুরুতে আব্বার চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর এখন বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তখন আমাদের এক আত্মীয় দেখতে এলেন। তাকে চা দিয়ে আপ্যায়িত করার পর তিনি তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলতে লাগলেন, বাগান থেকে আনা চা পাতার তুলনাই হয় না।

ঘটনার কথা মনে পড়লে অন্য ধরনের থৃল অনুভব করি। এসব স্মৃতিগুলো চাইলেও ভোলা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আব্বা, আম্মা সুদূর নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটান পড়ে থাকলেও তাদের মন পড়ে থাকবে শ্রীমঙ্গলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুটো চা বাগান মির্জাপুর এবং বৌলাছড়াতে।

আরেকটা ব্যাপারে বিস্মিত হই এই ভেবে, এ ধরনের রিমোট এরিয়া থেকে উঠে এসে আমাদের তিন ভাইবোন দেশের সেরা তিনটি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অবস্থান করছি। আরেক বোন লন্ডনে পড়ালেখা করছে। এসব সম্ভব হয়েছে হয়তো চা বাগানে থাকার কারণে। গ্রামে থাকলে হয়তো সম্ভব হতো না।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

ভ্যালেন্টাইনস ডে- তে

আমার চা খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। চা খেতাম না মজার এক কারণে।

আমাকে সবাই জিজ্ঞাসা করতো, আমি চা খাই না কেন।

বলতাম, চা বানাতে হবে, তাই। আসলে এ কথাটা শতভাগ সত্যি।

যখন ভুইয়া একাডেমিতে পড়তাম তখন আমার বন্ধু অশোকের বাসায় গেলে ওখানেই চা খেতাম মগ ভর্তি করে। চা খাওয়া বলতে ওখানেই। বাসায় কখনো চা খেতাম না আর আমার বাসার সবাই জানতো আমি শখে চা খাই।

আমি লন্ডনে থাকার সময় আমার বন্ধু–বান্ধবরা বলতো, জেনিথ, চা খাওয়া।

বলতাম, খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে বানিয়ে খা।

ওরা আমাকে খুব গালমন্দ করতো।

এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতাম।

আমার বৌ দীপা খুব চা পাগল। তার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সে আমার চা না বানানোর ব্যাপারটা জানে। ২০০০ সালের ভ্যালেনটাইনস ডে–র দিন সকালে আমার বাসায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। সেদিন আমার রুমমেটরাও ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার কাছে কি চাও? আজকের দিনে যা চাইবে তা–ই দেবো।

সে বললো, আমাদের সবাইকে তুমি চা বানিয়ে খাওয়াও তো।

কি আর করা!

তখন আমার হবু বৌ ভ্যালেনটাইনস ডে–তে আমার কাছে এই রকম একটা জিনিস চাইবে ভাবতেও পারিনি।

যাই হোক। মোট চার কাপ চা বানালাম।

এটা নিয়ে অনেক মজা করলাম সারা দিন।

এখন আমি দিনে তিন থেকে চার বার চা খাই, অবশ্যই না বানিয়ে। এই ব্যাপারটা আমার বৌ লন্ডনে থেকে কখনো চিন্তাও করতে পারবে না।

এই ডিসেম্বরে যখন সে দেশে আসবে পড়া শেষ করে তখন মনে হয় চা বানানোর ভয়ে আমার আবার চা খাওয়া বাদ দিতে হবে। ভ্যালেনটাইনস ডের মতো কোনো বিশেষ দিন ধরে যদি বলে তাহলে কি করবো চিন্তা করছি। যাই বলুক, আগে তো আসুক!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আমতলা, ঢাকা থেকে

মিল অমিল

– খন্দকার জিয়া হাসান

ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বিএনসিসি–র ক্যাডেট হিসেবে চোদ্দ দিনের টুরে সমগ্র সিলেট দেখার সুযোগ হয়েছিল। *লাক্কাতুরা টি এস্টেট* পরিদর্শনের সময় কর্তৃপক্ষ ওদের সেরা চা এক পাউন্ড করে সবাইকে উপহার দিল। বীরদর্পে সেটা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সবাই তাড়িয়ে তাড়িয়ে আমার চা খেতে লাগলো আর আমি তাকিয়ে রইলাম। কারণ আমার তখন চা খাওয়ার অনুমতি ছিল না।

এইচএসসি পড়ার সময় আব্বা একদিন সন্ধ্যায় বাইরে থেকে ফিরে আম্মাকে বললেন, চা দাও।

পাশ থেকে আমিও বললাম, আমাকেও দিও।

আম্মা কড়াভাবে না করলেন।

আব্বা বললেন, না, ওকেও দিও। ওকে এখন চা খেতে দেয়া উচিত।

মনে হলো এক লাফে অনেক বড় হয়ে গেছি।

আব্বা–আম্মার সবচেয়ে বড় অমিল ছিল চা। আম্মা জীবনে কোনোদিন চায়ে চুমুক দেননি আর আব্বা চা ছাড়া এক মুহূর্তও কাটাননি। দিনে গড়ে বারো চোদ্দ কাপ চা এবং সঙ্গে আড়াই চামচ চিনি – এই ছিল তার স্টাইল। ফলে চল্লিশ বছরের পর থেকেই ওনার দাত পড়া শুরু করে।

আমার স্ত্রী চা খায় বিশাল মগে, আগুন গরম চা এবং ঝড়ের গতিতে যেন শেষ করেই সে ট্রেনে উঠবে আর আমি আগুন গরম চা সার্ভ করাটা পছন্দ করি। কিন্তু খাই ঠান্ডা করে। আমার ছয় বছরের ছেলে রায়ান দুই বছর বয়স থেকে নাশতা করে শুধু চা এবং পরটা দিয়ে। পরটা রোল করে চায়ে চুবিয়ে খায়।

আম্মা একদম চা পছন্দ না করলেও তার আম্মা অর্থাৎ আমার নানু অসম্ভব চা পছন্দ করতেন। কাস্টমস অফিসার নানার সঙ্গে চা খেয়ে খেয়ে ওনার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পচিশ বছর আগে নানা তাকে ছেড়ে গেলেও তিনি চা ছাড়েননি। চা এবং কোল্ড ড্রিংকস – এই দুটো জিনিসে ওনাকে কখনোই না বলতে শুনিনি।

গত ২৮ মে ২০০৫, শনিবার দুপুরে নানু পনেরো মিনিটের বুকের ব্যথায় আমাদের ছেড়ে অন্য জগতে পাড়ি দিলেন। সন্ধ্যায় কফিন বক্সে নানুর শরীর চা পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো। বুকের ওপর একগাদা চা পাতা নিয়ে নানু চুয়াডাঙ্গা রওনা দিলেন যেখানে ওনাকে চিরনিদ্রায় শুইয়ে দেয়া হবে।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

চা প্রেমিকের ডায়রি

– জাকারিয়া আবির চৌধুরী

১৯৭১ সালে মালনীছড়া চা বাগানে পাক হানাদার বাহিনী নিরীহ চা কর্মকর্তাদের হত্যার মাধ্যমেই সিলেটে তাদের হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

সেই ১৯৭১ সালে একজন সন্তান সম্ভাবনাময়ী মা যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে কি না উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছেন তার অনাগত সন্তানকে নিয়ে। তখনো মায়ের সেই টেনশনের সঙ্গী ছিল কিছুক্ষণ পর পর এক কাপ চা, যেহেতু মায়ের শৈশব থেকে যৌবন কেটেছে সুন্দর চা বাগানে। লংলা চা বাগানে। গভীর রাত, উৎকণ্ঠা, পাক বাহিনী যদি হানা দেয়। যদিও তখন অনেক স্থানে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তবুও যুদ্ধের সেই রাতে ছেলেটি জন্ম নিল নভেম্বর মাসে। সেই রাতেও সকলের সঙ্গী ছিল এক কাপ করে চা, হয়তো লংলা চা বাগানে যুদ্ধের রাতে জন্ম বলে।

নানা ছিলেন বৃটিশ নেভির ইঞ্জিনিয়ার, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একজন নেভাল যোদ্ধা। অবশেষে জয়েন করলেন লংলা চা বাগানে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। সবাই এক নামে তাকে ডাকতেন ইঞ্জিনবাবু বলে। তার কাছ থেকে শুনেছি করাচির চা থেকে দার্জিলিংয়ের চা-এর স্বাদ ভিন্ন, আবার দার্জিলিংয়ের চা থেকে লংলা চা বাগানের চায়ের স্বাদ ভিন্ন। এক এক স্থানের চায়ের স্বাদ অন্য স্থানের চায়ের স্বাদ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট সম্পন্ন।

দার্জিলিং এবং নেপালের মশলা চা যে একবার পান করবে তার স্বাদ অনেক অনেক দিন পর্যন্ত তার মনে থাকবে। নানা চা খুব পছন্দ করতেন বলেই কিনা পূর্ব পাকিস্তান রেলওয়েতে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করেননি অথবা হয়তো চায়ের স্বর্গরাজ্য সিলেট ভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে জয়েন করেননি তা আজো আমাদের কাছে প্রকাশ করেননি।

একদা তিনি লন্ডনে জাহাজ থেকে নেমে অনেক কষ্টে ও পরিশ্রমের পর নেভাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করার সময় সেই স্কুলেরই একজন ইংরেজ সাহেবের সঙ্গে সখ্য হয়। প্রায়ই তিনি সাহেবের বাসায় যেতেন। নানা এলকোহল জাতীয় পানি পান করতেন না বলে সাহেব তাকে অন্যান্য নাশতার সঙ্গে এক মগ চা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। এক পর্যায়ে ইংরেজ সাহেবের মেয়ে মারলিন-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেও ইংরেজ সাহেবের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা তার দেশ ও বাবা-মাকে ভালোবাসেন বলে মারলিনকে বিয়ে করেননি। তবুও তাদের চা বন্ধুত্ব অটুট ছিল। বৃটিশ নেভিতে থাকাকালে যতোবারই লন্ডন গেছেন ততোবারই তিনি মারলিনের চায়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন।

নানা চা-কে এতোই পছন্দ করেন, তিনি কারো বাসায় গেলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে চা দেবো আপনাকে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাগ করে রাগ লুকিয়ে বলেন, না, দিতে হবে না।

তার যুক্তি হলো, ওই লোক চা দিতে চাচ্ছে না বলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করছে চা দেবে কি না। চা দিতে হলে সরাসরি নিয়ে আসবে, চা আবার কে না খায়? আজো এই ছিয়ানব্বই বছর বয়সে তার দিনে পাচ থেকে ছয় কাপ চা চাই-ই চাই।

১৮৫৭ সালে সিলেটের সুরমা উপত্যকায় মালনীছড়ায় চা বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ দেশে চা চাষের সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশে বর্তমানে একশ আটান্নটি চা বাগান রয়েছে। হবিগঞ্জে তেইশটি, সিলেটে বিশটি, চট্টগ্রামে বাইশটি, রাঙ্গামাটি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে একটি করে চা বাগান রয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলায় সর্বাধিক সংখ্যক একানব্বইটি চা বাগানের মধ্যে লংলা চা বাগানটি ছিল ডানকান ব্রাদার্সের সবচেয়ে বড় বাগান। এখানে তখনই ছিল একটি বড় হাসপাতাল। একপাশে একটি বিশাল মাঠসহ ক্লাব ঘর। ক্লাব ঘরে তখনই শুকার রোড ছিল যা এখনো বর্তমান।

আরো আছে চারদিকে সুন্দর চা বাগান ঘেরা একটি কৃশ্চিয়ানসের কবরস্তান ও ক্যাথেড্রাল। যদি দুপুর বেলা একা সেখানে যাওয়া যায়, চারদিকে বক্স আকারের কবরগুলো দেখে এক অন্য রকম অনুভূতি উপলব্ধি করা যায়। এরা সবাই এক সময় সেই লন্ডন থেকে এসে এই চা বাগানের চায়ের উন্নয়নের জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্যয় করেছিলেন।

বাগানে তখন নানার বাসায় মামা, খালারা মিলে অনেকেই থাকতেন। এর মধ্যে আমরা ভাগ্নে ভাগনি মিলে ছোটখাটো জনসভা। ফলে সকালে নাশতায় প্রায়ই ছোটদের রুটির সঙ্গে দেয়া হতো চা যাতে রুটি ভিজিয়ে খাওয়া যায়। একবার আমি বারো থেকে চোদ্দটি রুটি এক মগ চায়ে ভিজিয়ে খেয়ে ফেলি।

ছোট খালা জানতে চাইলেন, আর লাগবে?

বললাম, চোদ্দটি খেয়েছি।

সংখ্যাটি শোনার পর খালার চোখ দুটি একদম গোল হয়ে গেল যেন উপর থেকে দেখা দুই কাপ চা।

লংলা চা বাগানে চা তৈরি হতো পাচ ধরনের। এক থেকে দুই নাম্বার সঙ্গে সঙ্গে প্যাক হয়ে বিদেশে চলে যায়। দেশের বাজারে তিন থেকে পাচ নাম্বার চা বিপণন হয়। একবার চা ফ্যাক্টরি দেখতে গিয়ে এক নাম্বার চা চুরি করে এনে তৈরি করে খেয়েছিলাম। সত্যিই এক নাম্বার। এসবের অধিকাংশ নাকি ব্যবহার হয় রঙ তৈরিতে।

একবার মামার ফুপু সহ চা ফ্যাক্টরি দেখতে গিয়ে ফুপুর চাদরের নিচে মামা দুটি এক কেজি চায়ের ব্যাগ দিয়ে দেন, বের হওয়ার সময় পরহেজগার ফুপু চাঘরবাবুর সামনে এসে ভীষণ কাপন দিয়ে ধপ ধপ করে দুই দিক থেকে দুই ব্যাগ ফেলে দেন।

চাঘরবাবু ব্যাগ দুটি পরে ফুফুর জন্য বাসায় পাঠিয়ে দেন।

শৈশবের সেই ঘটনা এখনো মনে হলে ভীষণ লজ্জা লাগে। কিন্তু কিছুদিন আগে এই চা পাতা চুরির জন্য কেরানিবাবুর চাকরি চলে যায়।

নিমুর সঙ্গে প্রথম দেখা চা খাওয়ার সময়, নানার বাসাতে চায়ের টেবিলেই চোখাচোখির মাধ্যমে। জীবনের প্রথম ভালো লাগার অনুভূতি, ভাবলাম এই বুঝি ভালোবাসা, এই বুঝি প্রেম। সব কিছু নিয়ে ঝাপ দিলাম ভালোবাসার নদীতে। কিন্তু হায় এক ফারাক্কা বাধে আটকা পড়া যমুনার চকচকে বালিরাশি। কেননা চাকন্যার মতে, *ভালোবাসা এক ভয়ঙ্কর জিনিস। ভালোবাসা শুধু বিরহের গান, যে আনে চোখে শুধুই বান।*

মেজমামা ও আম্মা দুজনই লংলা চা বাগানে বড় হয়েছেন। দুজনের মধ্যে চায়ের কাপের ভেতরের চায়ের মতো সম্পর্ক। মামা সউদি থেকে আট বছর পর যখন আম্মার সঙ্গে দেখা করেন সেই রাতে তারা গল্প করে সারা রাত পার করলেন শুধু চা খেয়ে, এটা কি তাদের ভালোবাসা, না চায়ের প্রতি তাদের ভালোবাসা?

আমাদের ময়মনসিংহের বাড়িওয়ালার ছেলে কাজলভাইয়ের যখন এসএসসি পরীক্ষা তখন আমাদের একটি রুম তাকে একা পড়ার জন্য থাকতে দেয়া হয়েছিল।

আম্মা রাত জেগে পড়ার জন্য তাকে চা বানিয়ে দিতেন।

কিন্তু বাসার ভাঙা জানালা নিয়ে মালিক-ভাড়াটিয়ার ঝগড়ার মধ্যে কাজলভাই-ই ছিলেন বেশ জোরালো। অবশেষে একদিন তিনি তার ভুল বুঝতে পেরে বললেন, কাকি, আমাকে আর চা খাওয়াবে? আমি তো অপরাধী।

বলাবাহুল্য আমাদের বাসার চা ওই এলাকার সবার কাছে প্রিয় ছিল। কারণ আমাদের চা পাতা নানা লংলা বাগান থেকে পাঠাতেন। আম্মা অবশ্য সেদিন তাকে আবার চা দিয়ে আপ্যায়ন করেন।

ময়মনসিংহ যখন ছেড়ে আসি তখন পুরো এলাকার সবাই অশ্রু ভরা চোখে আমাদের বিদায় দেন যেন এ বাড়ির অতি প্রিয়জনের বিয়োগ ঘটেছে। খুব ভালো চায়ের আপ্যায়ন মানুষকে পর থেকে আপন করে দেয়।

ময়মনসিংহে চা বিষয়ে আরেকটি ঘটনা হলো, আমরা তখন সবেমাত্র কৈশোরে। পাড়ার সব কিশোর-কিশোরী দুই ভাগে ভাগ হয়ে শবেবরাতের রাতে চাদা তুলে চা খাওয়া এবং নফল নামাজ পড়া প্রতিযোগিতা হতো। সকাল থেকেই হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হতো। কেউ একশ, কেউ দেড়শ, কেউ ৮০ রাকাত নফল নামাজ পড়েছে। সঙ্গে কেউ বিশ কাপ, কেউ দশ, কেউ পচিশ কাপ চা খেয়েছে। এদের কেউ কেউ সকালেই ফজরের নামাজ কাজা করতো এবং কেউ কেউ সারা বছর তার নামাজের ধারেকাছে না গেলেও চা খাওয়া ছাড়তো না।

একদিন আম্মা বাসার জন্য চা তৈরি করছিলেন।

এক সুযোগে চায়ের কেটলির মধ্যে একটি পাকা বড়ই দিয়ে দিই।

সবাই সেদিন চা পান করে বলাবলি করছিল অন্য স্বাদের কথা, টক টক স্বাদ।

আমিও খেয়েছিলাম, স্বাদটা আমার কাছে অন্য রকম লাগলেও বিস্বাদ লাগেনি। যদিও সবাই মুখটি কেমন কেমন করেছিলেন।

স্কাউট ক্যাম্পে ভাইয়ার ওপর একদিন দায়িত্ব পড়লো চা বানানোর। তিনি জানতেন, চায়ের মধ্যে গরম মশলা দেয়া হয়। তিনি চায়ের মধ্যে দিয়ে দিলেন পেয়াজ। তার কাছে তখন পেয়াজ ছিল গরম মশলা। সেই চায়ের স্বাদও নাকি অন্য রকম ভালো হয়েছিল তার বর্ণনায়।

একবার ময়মনসিংহে ঢাকা–ভালুকা রোডে এক দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন লোক মারা গেল। তাদের মধ্যে এক বাচ্চার বাবা মাও ছিলেন। বাচ্চাটির কিছুই হয়নি। তারা আমাদেরই এলাকার আকবরিয়া পরিবারের ছিলেন। তাদের লাশ পোস্ট মর্টেম করে দুদিন পর কবর দেয়ার জন্য আনা হলো নাসিরাবাদ স্কুলের পাশের কবরস্থানে। দেখতে গেলাম। বরফ ও চা পাতা দিয়ে কাফন মোড়ানো লাশ দুটি থেকে কেমন যেন পরিচিত চা পাতার ঘ্রাণের সঙ্গে একটি বিচিত্র ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম।

ঘটনার তিন বছর পর্যন্ত এ ঘ্রাণ একা হলেই চলার পথে পেতাম! চা খেতে গেলে ঘ্রাণটি আরো তীব্র হতো! আম্মাকে ছাড়া কাউকে বলিনি। বড় হয়ে হুমায়ূন আহমেদের বই থেকে জানতে পারলাম এটা আমার *অডিটরি হ্যালুসিনেশন* হয়েছিল।

বদলির চাকরি, এক সময় আব্বা সিলেটে। কিন্তু সিলেটের ভাটি অঞ্চলের চায়ের স্বাদ বেশি ভালো না। অন্তত সিলেটের চা অঞ্চলের চা খাওয়ার অভ্যাস যাদের আছে তাদের কাছে। সিলেটে একটি বিশেষ অলিখিত নিয়ম, যারা চা খায় না তাদের এক কাপ খাটি গরুর দুধ দেয়া হয়। যেহেতু আমার বাড়ি ভাটি অঞ্চলে, সেই জন্য বিস্বাদময় চা থেকে রক্ষা পেতে এবং দুধ খাওয়ার লোভে চা খাই না বলা আরম্ভ করলাম। এভাবে প্রায় এক বছর চা খাইনি।

যাক, এক বছর পর একদিন শ্রীমঙ্গল থেকে ঢাকা আসবো, হঠাৎ একজন খুবই রূপবতী মহিলা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ঢাকা যাচ্ছেন? গেলে আমার এই চাচাকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

বললাম, অবশ্যই।

মহিলা ট্রেন ছাড়ার জন্য অপেক্ষা করছেন আর আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন।

এক পর্যায়ে তাকে আপা বলে ডাকায় এবং তাকে আপার স্থান দেয়ায় মহিলা খুবই খুশি হয়ে বলেন, তাহলে তো তোমাকে আর আপনি বলা যায় না। চট্টগ্রাম চলে যাবেন পরের মাসে, সেই জন্য চট্টগ্রামের ঠিকানা দিলেন।

আমিও তাকে বললাম, চট্টগ্রাম গেলে আপনার বাসায়ই থাকবো। এক পর্যায়ে ঘোষণা হলো ভৈরবে ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট করায় ট্রেন আজ ঢাকা যাচ্ছে না।

আপা বললেন, এবার তাহলে চলো আমার বাসায়, কষ্ট করে নবীগঞ্জ যেতে হবে না।

সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম পরের দিনের টিকেট কেটে।

বাসায় যাওয়ার পর তিনি ফ্রেশ হয়ে আসার পর এক কাপ চা দিলেন।

বলতে পারলাম না, আমি এক বছর ধরে চা খাই না। তাছাড়া সেই চায়ের ঘ্রাণে কি যে আকর্ষণীয় ছিল, কোনো কথা না বলে খেয়ে ফেললাম। সেই চা আমার জীবনের সেরা চাগুলোর একটি।

তিনি সেদিনই আমাকে বিটিআরআই চা বাগানে নিয়ে গেলেন বাগান দেখাতে। তার স্বামী ছিলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর। ফলে শ্রীমঙ্গলে তার বেশ পরিচিতি ছিল। সারা দিনে ও রাতে তার তৈরি করা সাত কাপ চা খেলাম।

সন্ধ্যার পর নিয়ে গেলেন স্থানীয় মার্কেটে। আমাকে একটি লাল পলো শার্ট ও একটি আমেরিকান জিন্স প্যান্ট কিনে দিলেন যা সিংগাপুরের তৈরি।

রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘুমাতে গেলাম বারোটায় দিনের শেষ কাপ চা পান করে। সারা রাতে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করলাম, একদম ঘুম এলো না। একটি সুন্দর দিনের পর নির্ঘুম রাত খুবই খারাপ লাগলো।

অনেক দিন পরে বুঝতে পারি দীর্ঘ এক বছর পর সারা দিনে সাত আট কাপ চায়ের প্রভাবে ঘুম আসেনি। কিন্তু রাতেই বুঝতে পারি সারা রাত আপাও ঘুমাননি। কারণ আজ রাতে সদ্য বদলি হওয়া দুলাভাইয়ের জুরি থেকে আসার কথা। কিন্তু আসেননি। সকালে আমাকে ঘুম না হওয়ার জন্য যতোটা ক্লান্ত লাগছিল তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি ক্লান্ত লাগছিল আপাকে। ভালোবাসার মানুষের জন্য রাত জেগে অপেক্ষার ক্লান্তি। তাই তো সকালে আপা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুম কেমন হলো?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, খুব ভালো।

সকালে চা নাশতার পর বিদায় দিতে শ্রীমঙ্গল রেল স্টেশনে আপা আমাকে তার একটি ছবি দিলেন। ছবির পেছনে লেখা, *আবিরকে   আপু*।

সেই থেকে পরবর্তী এক বছর দাগ কেটে কেটে হিসাব রেখে দেখলাম, এক বছরের পাচশ কাপ চা খাওয়া হলো, এভাবে জীবনে আমরা কতো যে লিটার লিটার চা খাচ্ছি তার হিসাব রাখবে কে?

আজো চায়ের কথা উঠলে আমার লাভ আপুর কথা মনে হয়।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

শুভাকাঙ্ক্ষী

– অপর্না লাবনী

আমি তখন এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। আমার ছোট ভাই জয় ক্লাস নাইনে পড়ে। ওকে একজন বাসায় এসে পড়াতেন। বাবার এক কলিগের পরিচিত সেই জন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশে অনার্সে মাস্টার্স করে চাকরির অপেক্ষায় তিনি।

আমি সাধারণত বাসায় থাকলে চা বানানোর ভার আমার ওপরই থাকে। ভাইয়ের টিচারকেও রোজ চা বানিয়ে বুয়ার মাধ্যমে পৌছে দিতাম।

সামনে না গেলেও অসংখ্যবার আড়াল থেকে দেখেছি তাকে। কি যেন আছে চেহারায় যা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করতো। ইচ্ছা হতো সামনে যাই, কথা বলি। কিন্তু মায়ের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার সাহস আমার ছিল না।

সবটুকু আবেগ ঢেলে খুব যত্নের সঙ্গে চা বানিয়েই তৃপ্ত হতে হতো আমাকে। সপ্তাহে তিন দিন পড়াতেন। তিনি জানতেন না বাকি দিনগুলো আমি ওনার প্রতীক্ষাতেই থাকি।

আমার ভাই নাইনের ফাইনাল পরীক্ষায় চমৎকার রেজাল্ট করলো।

বাবা এ প্রসঙ্গে বললেন, যার কাছে পড়ছে তাতে এ রকম রেজাল্ট করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

বাবার মন্তব্য শুনে ভীষণ খুশি হয়েছিলাম সেদিন আর ভাবছিলাম ওনার চাকরি হচ্ছে না কেন।

ইতিমধ্যে আমার এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হতে না হতেই বাবা বিয়ের সব ব্যবস্থা পাকা করলেন। পাত্র নাকি আগেই স্থির ছিল।

একদিন পাত্রের বাবা–মা এসে বালা পড়িয়ে আমাকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

সব কিছু আমার মনের বিরুদ্ধে হাওয়া সত্ত্বেও প্রতিবাদ করার সাহস পাইনি।

পরদিন তিনি এলেন।

যথানিয়মে চা বানিয়ে দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে দেখছি আর নিঃশব্দে কাদছি। কেন কাদছি তা ভেবে নিজেই অবাক হলাম।

ওনাকে ভীষণ বিষণ্ণ লাগছিল। দেখলাম চায়ের কাপটা অনেকক্ষণ দুই হাতে ধরে রাখলেন। তারপর আস্তে আস্তে খেলেন।

চা খাওয়া শেষ হলে তিনি আমার ভাইকে বললেন, জয়, আজই তোমাকে পড়ানোর শেষ দিন। এ চিঠিটা তোমার দিদিকে দিও।

দেখলাম তার চোখ নয়, কণ্ঠস্বর অশ্রুভারে টলমল করছে।

তিনি চলে গেলেন।

তিনি আমাকে যে চিঠিটা দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল –

অপর্না

প্রথমে ভালোবেসেছি তোমার চা–কে, তারপর তোমাকে। আমি তোমাকে কখনো দেখিনি। কিন্তু চায়ের মাঝে তোমার প্রতিচ্ছবি দেখেছি। তোমাকে কখনো স্পর্শ করিনি। তবে চায়ের কাপে তোমার পরশ পেয়েছি। এ পাওয়াটুকুর জন্যই এখানে ছুটে আসা।

সাত মাস আগে চব্বিশতম বিসিএস পাস করে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চাকরি পেয়েছি। সপ্তাহে তিন দিন ঢাকা থেকে গিয়ে ক্লাস নিয়েছি শুধু তুমি এবং তোমার চায়ের জন্য।

আমার এ ভালো লাগার কথা জয় জানে। ভেবেছিলাম দুই এক মাসের মধ্যে তোমার বাবাকেও জানাবো।

কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি যে তুমি...।

যাহোক, আজ আমার বিদায় ঘণ্টার ধ্বনি আমাকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে এখানে আমার সময় শেষ। আমার এ লেখাকে যদি তুমি অন্যায় মনে করো তবে এ দুঃসাহসকে ক্ষমা করো। আশীর্বাদ করি তুমি সুখী হও।

শুভাকাঙ্ক্ষী

কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ থেকে

রাঙাবৌদি

– সুভাষ চন্দ্র সেন

টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে ছাব্বিরভাইসহ বের হলাম হোটেল ইম্পিরিয়াল লজ থেকে। যাবো আলীপুর চিড়িয়াখানা ও বিড়লা মণ্ডল দেখতে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে একটা ট্যাকসি ভাড়া করা হলো। প্রথমে যাওয়া হলো বিড়লা মণ্ডল দেখতে। কলকাতা শহরের রাস্তা আমার তেমন পরিচিত না।

ট্যাকসিওয়ালা বিড়লা মণ্ডল–এর পাশে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। একটা দোকানের আঙিনায় দাড়ালাম। বৃষ্টি কিছুতেই থামছে না এবং সঙ্গে কোনো ছাতাও নেই।

সাব্বিরভাই বললেন, সুভাষভাই, মনে হয় আজকের বেড়ানোটাই মাটি হয়ে যাবে।

বললাম, এতো অধৈর্য হওয়ার কি আছে, সময় তো এখন মাত্র সাড়ে দশটা।

বৃষ্টির মাত্রা এতো বেড়ে গেল, রাস্তা পার হওয়ার সুযোগটাও পাচ্ছি না। অথচ আমরা কেমন বোকা, রাস্তার ওপাশটায় নামলে এতো বিড়ম্বনা হতো না।

থাক, যখন জায়গা চিনি না, তাহলে তো এমন বিড়ম্বনা হবেই।

দেখি একটা ট্যাকসি এসে ঠিক আমাদের সামনে এসে দাড়ালো। ওখান থেকে একজন মহিলা নামলেন। বললেন, আপনারা একটু সরেন।

সরে দাড়ালাম।

দেখি দোকানের দরজটা খুলে বসলেন।

এরই মধ্যে আমরা অনেকটা ভিজে গেলাম। ওই মহিলাকে ভদ্রতার সুরে বললাম, দিদি, একটু ভেতরে বসতে পারি?

দিদি নয়, বলুন রাঙাবৌদি। এ এলাকায় সবাই আমাকে রাঙাবৌদি বলে ডাকে। শুধু তা-ই নয়, আমার দোকানের চায়ের একটু বেশ সুনাম আছে।

এগুলো বলতে বলতে দেখি একটা ছোট সাইনবোর্ড বের করে দোকানের সামনে রাখলেন। একটু কৌতূহল জাগলো।

সাইনবোর্ডটা পড়ে দেখলাম ওখানে লেখা আছে, *রাঙাবৌদি টি শপ*।

সাব্বিরভাই হাসির দম রাখতে পারছেন না। আমাকে ফিশ ফিশ করে বলছেন, দেখেন তো কি কালো মহিলাটি। অথচ সবাই নাকি ডাকে রাঙাবৌদি। আর দেখেন মহিলাটির দোকানের কি বাহারি নাম *রাঙাবৌদি টি শপ*। যদি ফর্শা হতেন, তাহলে মহিলাটিকে কোন বিশেষণে বিশেষায়িত করতো জানি না।

আরে চুপ করেন তো। সে মন্তব্য পরে করা হবে। আপনার চাপা হাসিটা বন্ধ না হলে তো মাইন্ড করবে।

বললাম, আচ্ছা, রাঙাবৌদি আমাদের চা খাওয়াতে পারবেন?

হ্যা, অবশ্যই, বলুন কি চা দেবো? হলুদ চা, রঙ চা, ঝাল চা, দুধ চা, আদা চা, নিমের চা, শালগম চা, লবঙ্গ চা?

সাব্বিরভাইয়ের দিকে থাকালাম এবং বললাম, জীবনে এতো ধরনের চায়ের নাম তো শুনিনি। মহিলা বলে কি! সাব্বিরভাইও অবাক! তিনি বলেন, আমিও জীবনে চায়ের যে এতো বাহারি নাম থাকতে পারে তা কোনোদিন শুনিনি।

ঠিক আছে, যখন এতোক্ষণ ধরে এখানে বসে আছি, কিছু না খেলে কেমন দেখাচ্ছে?

কিন্তু মহিলাকে দেখে চা খাওয়া তো দূরের কথা, আমার পানি খেতেও তেমন ইচ্ছা হচ্ছে না। পরেছেন একটা কম দামি মোটা ফ্রেমের সানগ্লাস, ওটা দোকানে কাজ করছে না, এখনো খুলছেন না।

এরই মধ্যে ডাক শুনতে পেলাম, কি গো দাদা, বললেন না তো কি চা দেবো।

বললাম, এতো ধরনের চা কোনোদিন খাইনি, নামও শুনিনি। সুতরাং দুধ চা দেন।

কি আশ্চর্য ব্যাপার। আমার রুচির ধারণাটা পাল্টিয়ে দিল সেই মহিলার চা। রাঙাবৌদি দেখতে যেমনই হোক, তার হাতের চা খুব দারুণ। খুব নামি-দামি স্টলেও হয়তো এই ধরনের চা বানাতে পারবে না।

এদিকে সাব্বিরভাইও বলছেন, আমিও এ পর্যন্ত এতো ভালো চা কোনোদিন খাইনি।

তখন সাব্বিরভাইকে বললাম, তাহলে তো ওই মহিলাকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত।

হ্যা হ্যা, তা অবশ্যই।

এরই মধ্যে দেখলাম বেশ কয়েকজন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিলেন। এদের মধ্যে দুজন এসেছেন সুজুকি মারুতি কার নিয়ে। মনে মনে ভাবলাম, মহিলার চায়ের সত্যিকার অর্থে নামডাক আছে বৈকি!

কিছুক্ষণ পর দেখি এক লম্বা, মাথায় পাগড়ি বড় গোফওয়ালা লোক ঢুকতে ঢুকতে বলতে লাগলো, মাইজি নিম চা-ই হ্যায়?

মহিলা বললেন, হ্যায়।

দাড়ানো অবস্থায় এক মগ চা পান করে বেরিয়ে গেলেন ওই লোক। এদিকে বৃষ্টি থেমে গেল, আমরা বের হয়ে চলে গেলাম। সন্ধ্যায় ফেরার পথে সাব্বিরভাইসহ আবার উঠলাম রাঙাবৌদির চা স্টলে।

এবার বললাম, একটু রহস্য করে শালগম চা-ই হ্যায়?

মহিলা এক নজর চেয়ে বলে উঠলেন, *মুঝে মালুম হ্যায়, আপ লোগকি ইয়ে চা-ই আদত নেহি।*

একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, ঠিক অছে, ওই দুধ চা দেন।

তখন তাকে বললাম, আপনি কি করে বুঝলেন, ওই চা আমাদের অভ্যাসে নেই?

হ্যা, এটা আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা।

মহিলাকে আবারও ধন্যবাদ দিলাম। এখনো যখন চা খেতে বসি, ওই রাঙাবৌদির কথা মনে পড়ে।

পোমরা, রাঙুনিয়া, চট্টগ্রাম থেকে

স্পেশাল থেকে সাধারণে

– লাবণ্য

চা কথাটা শুনলেই আমার যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। অফিসে কিংবা বাসায় যেখানেই থাকি চা আমার চাই-ই চাই। এই চা আমার জীবনের একটি অধ্যায়ের সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত।

যখন এইচএসসি পাস করি তখন বিয়ে হয় খুব ধনী পরিবারের সবচেয়ে ছোট পুত্রটির সঙ্গে। প্রথম রাতেই বুঝতে পারি স্বামী আমার কিসে যেন আসক্ত। কয়েকদিন পর বুঝতে পারি তিনি ফেনসিডিলের পূজারি।

যাই হোক। তার প্রতিদিনের কাজ ছিল রাত বারোটা বা একটায় বাসায় ফিরে পরম মমতায় রান্নাঘরে গিয়ে নিজের হাতে নিজের জন্য এক কাপ চা বানানো। আর আমি বসে দেখতাম কি চরম তৃপ্তি নিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী চা-টা শেষ করতেন।

একদিন খুব আগ্রহ নিয়ে তার কাছ থেকে চেয়ে খেয়ে তার দিকে যখন তাকিয়েছিলাম তখন সে আমাকে বলেছিল, এটা খুবই স্পেশাল চা।

বেশি চিনি আর দুধ মিশ্রিত কঠিন চা যা নাকি শুধু তারাই খেতে পারেন যারা ফেনসিডিলের পূজারি।

আমি খুব কঠিন প্রকৃতির একটা মানুষ। পাঠক বুঝতেই পারছেন এই স্পেশাল চা খাওয়া লোকটার সঙ্গে আমার সাধারণ জীবনটাকে আর বেশি দূর নিয়ে যেতে পারিনি। তাই সমাপ্তি ঘটলো একটা বিবাহিত জীবনের একটি অধ্যায়ের।

আমি এখন সাত বছর এগিয়ে এসেছি। নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছা, সাহস আর দৃঢ় মনোবল সঙ্গে নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। কিন্তু এখনো যখন বেশি চিনি আর বেশি দুধ মিশ্রিত চা মুখে পড়ে তখনই মনে পড়ে স্পেশাল চায়ের কথা। তাই তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যারা আমার মতো এই স্পেশাল চায়ের সঙ্গে পরিচিত তারা এখনই তাদের স্বামী, ছেলে, ভাই, বন্ধুদের এই স্পেশাল চা থেকে সাধারণ চা খাওয়ার অভ্যাসে নিয়ে আসুন।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সুন্দর জীবন গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করুন।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

দাদি

– মনোয়ারা

প্রতিবেশী দেশ ইনডিয়ায় একবার এক ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম ১৯৯০ সালে। সেখানে একটি গ্রুপের সঙ্গে এসপ্লানেড থেকে মেট্রতে রবীন্দ্র সদনে নেমে ফুটপাথে কাগজের গ্লাসে চা খেতে গিয়ে পুরো চা–টাই পড়ে গেল। আমার ধারণাই ছিল না, এতো নরম কাগজের গ্লাসে চা খাওয়া যায় বা এ রকম চা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে ইনডিয়ায় মাটির পাত্রেই বেশি চা খাওয়ার প্রচলন ছিল। তখন সেটাও আমার কাছে নতুন ছিল।

আমরা ছেলেবেলায় বাংলা ম্যাগাজিন *সভিয়েট ইউনিয়ন* নিয়মিত পড়েছি। তখন বিভিন্ন প্রকার চায়ের কথা লেখা থাকতো গল্পে। যেমন *গোলাপ চা, ঘিয়ের চা* ইত্যাদি। নাইন টেনে পাড়ার সময় ওই চাগুলোর স্বাদও নিয়েছি।

তবে ছোটবেলার চায়ের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাই লিখবো। তখন বেশ ছোট, সন তারিখ মনে নেই। আমার আপন দাদা–দাদি দেখিনি। দাদিকে ছবিতে দেখেছি, দাদাকে দেখিনি। কারণ ওনারা অনেক আগেই গত হয়েছেন। আমার বাবার মামা–মামি (আমাদের দাদা–দাদি) সব সময় আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন আম, জাম, বরই, কাঠাল, চিড়া, মুড়ি, তাল, পিঠা নিয়ে।

বাড়ির কামলার মাথায় এতো সব খাবার–দাবার তুলে দিয়ে এক সঙ্গেই হেটে আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের বাড়ি নরসিংদী সদরে। তাই আমাদের হাটার অভ্যাস কম। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে আমরা যাতায়াত করতাম রিকশা, নৌকা, বাসে। কিন্তু সেই দাদা–দাদির বাড়িতে যেতে হলে সাত মাইল হাটতে হতো। গ্রামের নাম চলনা।

আমরা দাদা–দাদির স্বাদ নিয়েছি ওই দাদা–দাদির কাছেই। পরবর্তীকালে দাদার মৃত্যু হলে দাদিই এ আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করে চলেছেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

সত্তর দশকের ঘটনা।

একবার আমরা ওই দাদার বাড়ি বেড়াতে যাই কয়েকজন ভাইবোন মিলে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা আর হাটতে পারি না। তখন আমরা একটা বড় কাঠাল গাছের নিচে বসে পড়ি। পাশে আখের রস জাল করছিল বিরাট বড় কড়াইতে। ওইখানকার গ্রামবাসীরা আমাদের দেখে কলার থোড় (মোচা) ওই জাল দেয়া কড়াইতে ছেড়ে দিল। তারপর কিছুক্ষণ পর তুলে প্লেটে করে আমাদের খেতে দিল, সঙ্গে পানিও দিল।

আমরা সবাই খুব মজা করে খেলাম। খুবই মিষ্টি স্বাদ খেতে। এ ধরনের খাবার আমরা আর খাইনি, দেখিওনি।

এদিক দিয়ে এক ভাই আমাদের তাগাদা দিল তাড়াতাড়ি চল সন্ধ্যা হয়ে যাবে। আবার বলে, এবার কুচি হাটা দাও, কুচি হাটা দাও (ছোট ছোট স্টেপে হাটা), তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। কষ্ট হবে না। তবে আমরা বহু কষ্টে গোধূলির লগ্নে অবশেষে দাদাবাড়িতে পৌছেছি। ওই বাড়ির ভাইটি ছাড়া আমাদের সবার পা–ই ফুলে গেছে। আমার এক চাচাতো বোন বলে, আমি কোরআন নিয়ে কিরা (প্রতিজ্ঞা) কাটলাম জীবনেও এতো দূর হেটে আসবো না।

দাদি আমাদের দেখে খুব খুশি। সঙ্গে সঙ্গেই হাত মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করে আমাদের জন্য বারান্দায় পাটি পেতে গুড়–মুড়ি খেতে দিলেন।

আমরা গুড়-মুড়ি খাচ্ছি, এমন সময় দাদি বড় একটা টিনের মগে চা আর আমাদের জন্য ছোট ছোট গ্লাসে চা দিলেন। বললেন, নুন চা খাও, শরীরের বিষ ব্যথা সেরে যাবে।

তিনি একটি জলচৌকিতে বসে ওই চা তৃপ্তি সহকারে পান করছেন।

চায়ের রঙ দেখতে কালো কুটকুটে। আমি যেই না একটু চা মুখে দিয়েছি, যেমন তিতা তেমন লবণ। এটা অবার কেমন চা! আমার ওই দাদি দেখতে বিশাল দেহের অধিকারী, আবার মুখ খারাপ করে বকাও দিতেন। তাই আমরা ওই দাদিকে ভয় পেতাম। কেউ সাহস করে বলতে পারলাম না ওই চা খাবো না।

আপা বললেন, একটু একটু করে খেয়ে নে। না হলে দাদি বকা দেবে।

দাদি আমাদের বলেন, সকাল-বিকাল নুন চা খাবি, তাহলে অসুখ-বিসুখ হবে না।

এবার বলি দাদির এ গণ্ডগ্রামে থেকে এই খাওয়ায় অভ্যাস হলো কিভাবে? দাদা বৃটিশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে দাদার ফ্যামেলি করাচিতে থাকতেন। সেখানেই সম্ভবত দাদির এ অভ্যাস গড়ে উঠেছে। যাহোক, আমরা খুব কষ্ট করে ওই দিন ওই চা পান পর্ব শেষ করি। এতোটা বছর পরও ওই চায়ের কথা মনে হতেই তিতায় মুখটা বেকে গেল।

নুন চা কতোটা উপকার জানি না। আমার ওই দাদি সাধারণ সর্দি-জ্বর, অসুখ-বিসুখ ছাড়াই বেচেছিলেন অনেক বছর। এবং ওই বয়সেও উনি হেটে, বাসে, রিকশায় চড়ে ছেলের বাসায় ঢাকায় এসেছেন।

তখন ১৯৯৫ সাল। একদিন তার ছেলে টুকু কাকা ফোন করে বলেন, আনু (আমার আপা)-কে নিয়ে বাসায় এসো, মা এসেছে। তোমাদের দেখতে চান?

আমি আর আপা ওই দিনই বিকেলে বিডিআর-এর ভেতর কোয়ার্টারে যাই কাকার বাসায়। গিয়ে দেখি দাদি ডাইনিংয়ে বসে কাকাকে চামচ দিয়ে একটি একটি করে রসগোল্লা (নরসিংদী থেকে আনা) খাওয়াচ্ছেন।

আমার ওই কাকারও বয়স হয়ে গেছে। ওনার সব চুল-দাড়ি সবই একেবারে শাদা। রিটায়ারমেন্টের সময় হয়ে গেছে।

দাদি আমাদের মিষ্টি খেতে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর কাকি একটি বড় মগে দাদিকে নুন চা দিলেন। আমাদের দিলেন দুধ চা।

ওই দিনই দাদির সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা হয়। তার কিছুদিন পরই শুনি দাদি আর নেই। আমার কানে এখনো মনে হয় বাজছে সেই দরাজ গলায় দাদি বলছেন, নুন চা খাবি। অসুখ-বিসুখ হবে না।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

চক্র

– কামাল

চা খাওয়ার পর পরই মাথা ঝিম ঝিম শুরু হয় লাবনীর। তন্দ্রাচ্ছান্ন হয়ে পড়ে সে। অর্ধঘুম অর্ধজাগরণে বুঝতে পারে তাকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে।

কে যেন ঘাড়ের ওপর দিয়ে দুই হাত জামার ভেতর ঢুকিয়ে স্তন মুঠো করে ধরে আছে। যোনিতে পাজামার ওপর দিয়েই লাবনী আঙুল সঞ্চালন অনুভব করে। শত চেষ্টা করেও হাত পা ছুড়তে পারে না সে। আরো গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

জ্ঞান ফেরে যৌনাঙ্গের তীব্র ব্যথায়। নিজেকে আবিষ্কার করে মুনীর তার সম্পূর্ণ বিবস্ত্র শরীরের ওপর মহা বিক্রমে ধর্ষণ করে চলেছে। মুহূর্তে মুখ থেকে গোঙানির শব্দ বের হয়ে আসে লাবনীর এবং তার মুখ চেপে ধরা হয়। আবার জ্ঞান হারায় সে।

এলাকা, পাড়া, এমনকি কলেজেও সেকেন্ড ইয়ার, অনার্সের ছাত্রী লাবনী ছিল সুন্দরী। কষ্টে, দুঃখে, ক্ষোভে কান্নাকাটি করে অস্থির অবস্থায় বাড়িতে দিন কাটছিল লাবনীর। নির্দিষ্ট সময়ের পরও যখন পিরিয়ড হলো না, ভয়ে বাধ্য হয়েই ছুটে গেল মুনীরের কাছে।

মুনীর জানালো, বিষয়টির জন্য সে একা দায়ী নয়, বরং সাগর ও আনু বেশি উদ্যোগী ছিল এবং সেদিন তারাই তার আগে ওকে ভোগ করেছিল।

কেউ দায়িত্ব নিতে চাইলো না।

সাগর আবার পরাক্রমশালী রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের উদীয়মান নেতা। সময় ১৯৯৯ সাল।

সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অসহায় লাবনীকে আবারও ভোগ করলো বন্ধুদের মেসে নিয়ে সাগর। তারপর সাহায্য তো দূরের কথা, সাগর আর পাত্তাই দিল না লাবনীকে। সম্পূর্ণ অস্বীকার করলো বিষয়টি।

লাবনী নিজের ঘরে ফ্যানের সঙ্গে ফাসি লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ময়না তদন্তে গর্ভধারণের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।

জানি না এ লেখা ছাপা হবে কি না। হলেও সাগরদের পড়ার কথা নয়। যাযাদি তাদের জন্য নয়। জানি না তাদের চা চক্র এখনো চালিয়ে যাচ্ছে কি না।

যে চা কোটি মানুষের মন ও শরীর চাঙ্গা করে সেই চা-ই লাবনীর মৃত্যুর কারণ হলো!

আমি চা খাই না বটে, তাতে কি? বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের প্রথম পছন্দই তো চা।

আগারগাও, ঢাকা থেকে

সেই এক কাপ

– সালমা সাদাত মোনা

এমন করে চায়ের চক্রজালে আটকে যাবো বুঝতেই পারিনি। আমি আর বাবা চায়ের ব্যাপারে খুবই শৌখিন। চাকরির খাতিরে বাবাকে প্রায়ই দেশের বাইরে যেতে হতো। কিছু না আনুন, এক প্যাকেট চা বাবার সুটকেসে পাওয়া যাবেই।

ছোটবেলায় মনে আছে, একবার বাবার সুটকেস থেকে বের হলো অরেঞ্জ পিকো (Pekoe)। আমি তখন চায়ের সঙ্গে অতো পরিচিত নই।

মা চা বানানোর জন্য প্যাকেট হাতে নিতেই বাবা হাঃ হাঃ করে উঠলেন।

আমি অবাক, ব্যাপার কি!

বাবা বললেন, এই চা-টা খুব শখ করে এনেছি, বুঝলে! এটা একটু স্পেশালভাবে বানাতে হবে। তা না হলে এর মজাই পাওয়া যাবে না।

মা ভ্রূকুটি করে বললেন, চা চা-ই, এর আবার স্পেশাল কি? দুধ, চিনি মেশাতে পরিমাণটা একটু ঠিক রাখতে হয়, এই আর কি! যারা দুধ, চিনি বেশি খায় তারা বেশি দেবে, কম খেলে কম।

দুই হাতের ওপর মুখটা রেখে বাবা উদাস সুরে বললেন, *ছাগলে যদি হাল চাষ করতে পারতো বলদ কি আর কেউ কিনতো!*

সুটকেস থেকে অন্য জিনিসপত্র বের করতে করতে মা বললেন, কি বলছো বুঝতে পারছি না। তোমার যত্ত সব অদিখ্যেতা।

সেই তখন থেকেই শিখেছি চায়ের কদর, শৌখিনতা। চায়নিজ টি, গৃন টি, জেসমিন টি, হেন চা নেই আমি আর বাবা যার স্বাদ গ্রহণ করিনি।

চায়ের কাপে চমুক দিয়ে কি করে তার স্বাদ প্রথম *সিপ* (Sip) মুখে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হয় তা বাবাই আমাকে শিখিয়েছিলেন। চোখ বন্ধ করে থাকতে পারলে আরো ভালো। এভাবেই আস্তে আস্তে চা আস্বাদন করতে হয়। চা খুব গরমও হবে না আবার ঠাণ্ডাও না।

চায়ে দুধ, চিনি *নৈব নৈব চ,* হালকা লিকারে একটু চিনি ও লেবুর রস দিয়ে ঠাণ্ডা করে খেলে মন্দ লাগে না। এটা অবশ্য অনেক পরে শিখেছি।

বাবা বলতেন, সবচেয়ে বিস্বাদ চা, ফ্লাস্কে রাখা চা।

প্যাকেটের গায়ে নির্দেশাবলী মেনেই সব সময় চা বানানো হতো। ছোটবেলা থেকে তো খুব ভালোই বানাতে পারতাম। এমনই কপাল, বিয়ের পর দেখি স্বামী চায়ের ব্যাপারে আরো এক কাঠি সরস। চায়ের আসল স্বাদ বজায় রাখার জন্য *হুইসল কেটলি* আমদানি করা হলো। শৌখিন চা পিপাসুদের জন্য পানি সিদ্ধ একটা বড় ফ্যাক্টর। কেটলিতে হুইসল বাজার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে চা বানাতে হবে। তা না হলেই চায়ের স্বাদ বিকৃত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

চা এতো ভালোবাসি, অথচ চায়ের ফ্যাক্টরি দেখবো না, তা কি হয়! কাজেই সুদূর সিলেটে চা বাগানের ছায়ায় ঘুরে চা ফ্যাক্টরি দেখতে গেলাম।

ওমা! সেখানে গিয়ে দেখি *দুটি পাতা একটি কুড়ি* না হয়ে চারটি পাতা একটি কুড়ি হয়ে দমাদম মেশিনের মধ্যে পেস্ট হচ্ছে চা পাতা। ফ্যাক্টরির মধ্যে শব্দের জন্য তো নিজের কথাও শোনা যায় না। তাই বোবারা যেভাবে আঙুলের সাহায্যে কথা বলে সেভাবেই ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা কি!

ভেজাল, চায়েও ভেজাল! একটি পাতাসহ ডাল তুলে তাকে দেখালাম।

ম্যানেজার তার অভ্যাস মাফিক প্রাণপণ চিৎকার করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, ভেজাল না, মেশিনের শেষ মাথায় যখন চা বের হবে তখন গ্রেডিং হয়ে বের হবে।

মনে মনে ভাবলাম, জানি না বলে খুব যাহোক বুঝিয়ে দিলেন।

চলো তোমার মেশিনের শেষ মাথায়।

আরে সত্যি তো, সেখানে মেশিনের গোল অংশটি ঘুরে ঘুরে চা বের করে দিচ্ছে। মেশিনের মুখে ছাকনি লাগানো বিভিন্ন সাইজের আর নিচে আলাদা ব্যাগে চা পড়ছে গ্রেডিং হয়ে। সাগুদানার ডাবল সাইজ থেকে শুরু হয়ে একেবারে গুড়ো, মিহি এবং এই গুড়ো মিহিটাই নাকি বেস্ট টি বলে পরিগণিত হয়।

তার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য ম্যানেজার এক প্যাকেট চা আমাদের গিফট দিলেন।

এতো যত্ন, এতো সব করেও আমার স্বামীর সেই এক কাপ চায়ের দুঃখ ভোলাতে পারলাম না। তার জীবনের কোনো এক মোক্ষম মুহূর্তে তিনি এক কাপ চা মিস করেছেন!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে তিনি যখন তৃপ্তির আনন্দে শরীরে একটা রিনরিনে ভাব অনুভব করেন তখনই তার সেই দুঃখটা চাগিয়ে ওঠে। তার উপর আবার আজকাল পত্রপত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় চায়ের শত গুণ। আহা! বেচারা, দুঃখ হওয়ারই কথা! ঘটনাটা এমন –

খাওয়া দাওয়ার পর ননদিনী আমাকে আমার বাসরঘরে নিয়ে এলো। ছিমছাম গুছানো ঘরে একটু এটা–ওটা নেড়ে বৈবাহিক সূত্রে এক বছরের বড় ননদিনী আমাকে আদর করে একটু দুষ্টামির হাসি হেসে বললো, বুঝলে ভাবী, এই রাত মেয়েদের জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ রাত। সারা রাত জেগে কাটিও।

কিছু না বলে হাতের ঘড়িটা দেখলাম। লাফ দিয়ে উঠে বললাম, দেখেছো, সাড়ে এগারোটা বাজে।

আমি এখুনি গিয়ে ভাইয়াকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বলে ত্বরিত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিনিট বিশেক পরে ফিরে এলো দুই কাপ চা নিয়ে। মুখে হাসি, বললো, ভাবী, সোহেল বললো চা খেয়ে চাঙা করবে। তাছাড়া সারা রাত তো জেগেই থাকবে। সোহেলের তো চা না খেলে মুডই আসে না।

আসে না বুঝি। এক গ্লাস দুধে পেস্তা বাদাম ও একটু ভাং মিশিয়ে দিও। সোহেলের চায়ে এখন আর কিছু হবে না।

তুমি জানলে কি করে? চোখ গোল গোল করে বললো ননদিনী রিমা।

কেন, হিন্দি সিনেমা দেখে!

আজ আমার বাসর রাত। আমার বাইশ বছরের উদ্বিগ্ন যৌবন প্রতীক্ষারত। তার উপর আমি কামসূত্র একেবারে ঝাড়া মুখস্থ করে এসেছি। ওই এক কাপ চায়ে তোমার ভাইয়ারও কিছুই হবে না।

তোমার ভাইয়াকে চায়ে চুমুক দেয়ার সুযোগই আমি দেবো না। চায়ের কাপ যেমন রেখেছো, সকালে এসে তেমনি উঠিয়ে নিয়ে যেও। অন্য কোনো ব্যবস্থা জানা থাকলে তা-ই করতে বলো।

এতোক্ষণ যদিও বা কোনো রকমে হাসি চেপে-চুপে রেখেছিলাম। কিন্তু ভাইয়ার সমূহ বিপদ আশংকায় রিমা যা একখানা মুখ বানিয়েছে আর হাসি চেপে রাখা গেল না।

এবার রিমা আমার দুষ্টামি বুঝতে পেরে উহ ভাবী বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, যাই, ভাইয়াকে বলি গিয়ে।

আতংকিত স্বরে বললাম, কি বলবে তোমার ভাইয়াকে?

রিমা হেসে বললো, নাহ মানে, তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হিঃ হিঃ করে হাসতে হাসতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সকালে চায়ের কাপ নিতে এসে রিমা সত্যি অবাক হয়ে গেল। কাপ ভরা চা অমনি পড়ে আছে। একান্ত কাছে এসে সংগোপনে বললো, ভাবী, আমাকে ওই সব শিখিয়ে দেবে?

ইনোসেন্টলি বললাম, কোন সব বলো তো?

রিমা একটু বিড়ম্বিত মুখে বললো, ওই যে, ওই সব! তুমি বললে না, যা করলে ভাইয়া চা খেতেই ভুলে যাবে!

ওর গাল দুটো টিপে একটু আদর করে বললাম, দুর বোকা মেয়ে, চায়ে একটু নুন ফেলে দিয়েছিলাম।

শুনে রিমা চুপ করে বসে রইলো। কথাটা মোটেই তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলো না।

তোয়ালে কাধে ফেলে বাথরুমে যাবার সময় ঘাড় ঘুড়িয়ে একটু আড় চোখে দেখলাম রিমা তার তর্জনী পুরোটাই চায়ের কাপে ডুবিয়ে দিয়েছে।

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

বন্ধু

– রানা হাসান

২ মার্চ ১৯৯৩। ইংরেজি বিভাগের পৃলিমিনারি পর্বের ছাত্র হিসেবে ইউনিভার্সিটির ছাত্রত্বের শুরুটা এদিনেই। প্রথম দিনের ক্লাস শেষে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাঝে আর্টস বিল্ডিংয়ের প্রবেশ পথের সিড়িতে খানিকক্ষণ বসলাম। একা। হালকা বৃষ্টি। ইচ্ছা হলো চা সিগারেট খেতে। সামনেই বাচ্চুর দোকান। একটা বেনসন নিলাম। ছোট টঙ দোকানের পাশে দাড়িয়ে এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম। এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে চায়ের কাপ। দুটোই এক সঙ্গে খাওয়ার বদঅভ্যাস অনেক দিনের।

চায়ের কাপে চুমুর মতো করে প্রথম চুমুক দিতেই দেখি সিড়ি বেয়ে নেমে আসছে এক সুন্দরী। একটু আগেই আমরা সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (এসএমআই) স্যারের ক্লাসে বসেছিলাম ঠিক সামনে-পেছনে। পৌনে এক ঘণ্টা ধরে তার পেছন দিকটাই দেখেছি। চোখাচোখি হতেই মৃদু আওয়াজ দিয়েই বললাম, চা খাবে।

দশ ফিটের রাস্তার ওপাশ থেকে হাসি মাখা মুখে জবাব এলো, না।

হঠাৎই দুষ্ট বুদ্ধির ঝলক দিল মাথায়। ইশারায় হাতের সিগারেট দেখিয়ে বললাম, তাহলে সিগারেট খাও।

আমি ইশারা করলেও অপরপ্রান্ত থেকে মৃদু জোরেই জবাব এলো, না, ওটা ছেড়ে দিয়েছি।

চেহারা দেখেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ইউনিভার্সিটির প্রথম বান্ধবী হতে পারে সেই। এমন ভাবনার উপসর্গ হিসেবে দেখলাম তার পাল্টা দুষ্টুমি। ঠেকায় কে। অনায়াস চেষ্টাতেই সে হয়ে গেল আমার প্রথম বান্ধবী। তার সূত্র ধরেই একে একে বান্ধবীর সংখ্যা দাড়ালো জনা বিশে। বান্ধবীর সংখ্যা স্ফীত হওয়ার পাশাপাশি বন্ধুদের সংখ্যাও বাড়তে থাকলো। পৃলিমিনারির গণ্ডি ছেড়ে অনার্সের প্রায় সব সেশনের ছেলেমেয়ে, এমনকি বিভাগের অফিস কর্মকর্তারাও হয়ে গেলেন বন্ধুতুল্য।

এক কাপ চা খাওয়ার প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে পেয়ে গেলাম অনেক কিছু। চা খাওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তার সঙ্গে সেই যে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব তা বারো বছর তিন মাস একুশ দিন পরও খাদহীন, নিখুত আর অটুট। বিপরীত লিঙ্গের বন্ধুত্ব। যখন-তখন এক সঙ্গে হেথায় সেথায় যাওয়া-আসা। সিনেমা মেলা, মার্কেট উৎসব, এমন আয়োজন নেই যেখানে আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে দেখা যেতো না।

ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকলে সে আমার বাসায়, আমি তার বাসায়, এ নিয়মে প্রতিদিনই দেখা হতো। দূর থেকে দেখলে এমন সম্পর্কে অনেক কিছুই ভাবার অবকাশ থাকে। অন্যরা তো বটেই, আমাদের দুই পরিবারের প্রিয়জনরাও হয়তো তাই ভেবেছেন। আমরাও বুঝতাম। সে সঙ্গে চাইতাম বন্ধুত্বটা অটুট রাখতে। কে কি ভাবলো তা নিয়ে আমরা কখনোই কিছু ভাবতাম না। আমরা ভাবতাম, সবার ধারণা কি করে ভুল প্রমাণ করা যায়। সে চেষ্টায় আমরা আজ পর্যন্ত সফল। দারুণ সফল।

কখনোই শারীরিক সম্পর্কের কথা বিবেচনাতেই আনিনি। দুজনের কেউই না। তাই বলে সেক্স নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো না, তা নয়। হতো এবং সেটা যথেষ্ট শালীনতার মধ্যে। এর বাইরে দুজনে প্রাণ খুলে কথা বলতাম। দুজনের জীবনে ঘটে যাওয়া কোনো কথাই বাদ যেতো না। আমার প্রথম প্রেম, তাতে ব্যর্থ হওয়া, তার প্রথম প্রেম ব্যর্থ করে দেয়া সব কিছুই।

পরিচয়ের শুরুতেই জানতে পারি তার জীবনের দুঃখের কাহিনী। ফোনফ্রেন্ডের ব্ল্যাকমেইলে তার জীবনের তখন ত্রাহি অবস্থা। নানা কারণে আমার তখন সমাজের সব শ্রেণীতে ওঠা-বসা। সেই সূত্রে এক দাগী ছাত্রনেতার সহযোগিতায় তাকে অসহনীয় কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থাও করি। এসবের মধ্য দিয়ে আমরা দুজনেই দুজনার ওপর ততোদিনে দারুণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ি। একেবারে হরিহর আত্মা।

এরই মধ্যে নিজেদের মধ্যে আমরা খুজে পেলাম দারুণ কিছু মিল। নামের মিল তো ছিল। শুরুর ঘটনা। পছন্দ আর অপছন্দের বিষয়ে শুধু নয়, তার গ্রামের বাড়ি, যে হাসপাতালে জন্ম তার, আব্বার মৃত্যুর কারণ, জন্ম মাস, বেড়ে ওঠার গল্প, ভাইবোনের মধ্যে তার-আমার অবস্থান, এমনকি একই ডাক্তারের অধীনে ছিলেন আমাদের মায়েরা, আশ্চর্যজনকভাবে জীবনের আরো কিছু স্বাভাবিক ঘটনায় দুজনের ছিল অস্বাভাবিক মিল। সর্বশেষ মিলটি হয়েছে আমাদের দুজনের শ্বশুরবাড়ি একই জেলার, একই থানায়।

আমরা দুজনেই এখন বিবাহিত। বন্ধুর এক মেয়ে, এক ছেলে। আমার এক ছেলে। এখানেই একটু তফাত। জানি না হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমার একটি কন্যা সন্তান পৃথিবীতে এসে মিলিয়ে দেবে এক্ষেত্রেও। আমাদের এই বন্ধুত্বটা আজও টিকে আছে। মাঝে মধ্যে মনে হয় বন্ধুত্বটা যেন আরো দৃঢ় হয়েছে।

আমার স্ত্রী যেমন জানেন, তার স্বামীও তেমনি জানেন সব। মনে হয় তারাও অনেকটা বাধ্য হয়েই মেনে নিয়েছেন। না নিয়ে উপায়ও নেই। আমার স্ত্রী বিয়ের আগে থেকেই জানতো, খুব ভালো করেই জানতো আমাদের সম্পর্কের কথা। তার স্বামীও অনেকবার দুজনকে দেখেছেন এক সঙ্গে। এখনো আমাদের দেখা হয়, কথা হয়। হয়তো আগের মতো নিয়ম করে প্রতিদিন দেখা হয় না। দুজনের মন খারাপ থাকলে এখনো ভালো করার একমাত্র উপায় দুজনে প্রাণ খুলে কথা বলা। প্রকাশ্যেই আমরা এ কাজটি এখনো করি।

একটি দৈনিকে সাংবাদিকতার কারণে সময় বের করা আমার জন্য কঠিন। কিন্তু ফোন তো হাতের মুঠোতেই। সুতরাং মন খারাপ হলে যোগাযোগটা অবধারিত। বাধা দেয়ার কেউ নেই। তারচেয়েও বড় কথা, আমরাই কেউ কাউকে এড়াই না, এড়াতেও চাই না।

আমার জীবনের সব গল্প জানলেও একটি কথা আমার এই প্রিয় বান্ধবীটি জানে না এখনো। জানি না এ লেখা তার চোখে পড়বে কি না। তোমাকেই বলছি, চোখে পড়লে মাফ করে দিও। বিষয়টি হলো, চা দিয়ে আমাদের এ অদ্ভুত সম্পর্কের শুরু। এ কারণে তার সঙ্গে যখনই সময় কাটিয়েছি, বেশি চিনি দিয়ে এক কাপ চা খেয়েছি প্রতিবার। তার সঙ্গে সময় কাটিয়ে প্রচণ্ড গরমে কোক-পেপসি খেলেও বিদায়ের সময় চা খেতে ভুলতাম না। অবশ্যই তা বেশি চিনি দিয়ে। সেও বিষয়টি লক্ষ্য করতো। বাধা দিতো। শুনতাম না। সেই বেশি চিনি দিয়ে চাখেকো আমি এখন ডায়াবেটিস রোগ নিয়ে বাস করছি। চা এখনো খাই। যতোদিন বাচবো ততোদিন খাবো। অন্তত দিনে একবার হলেও। এমনকি চিনি কম দিয়ে হলেও।

মতিঝিল, ঢাকা থেকে

সেই পুরনো গল্প

– সৈয়দ নোমান আজমী

বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগে ইনডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চা শিল্পে কাজ করার জন্য জনগোষ্ঠিকে নিয়ে আসা হয়েছিল শ্রীমঙ্গল তথা সিলেটের চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায়।

পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল দাসত্বের শৃংখলে বন্দী, শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনার শিকার এই চা শ্রমিক জনগোষ্ঠি সিলেট তথা বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মুখ দেখালেও তাদের জীবনের কোনো উন্নতি হয়নি। এই চা শ্রমিক জনগোষ্ঠির সকরুণ চোখে করুণার কাজল মাখাতে এগিয়ে আসেনি বৃটিশ বেনিয়া থেকে শুরু করে আজকের শাসক গোষ্ঠির কেউ। সবাই তাদের বঞ্চনার আস্থাকুড়ে নিক্ষেপ করেছে।

এখনো তারা দৈনিক মাথাপিছু ছাব্বিশ টাকা হারে বেতন পায় যা বাংলাদেশে সর্বনিম্ন বেতন। অথচ বাজেটে প্রতি বছর চা শিল্প থেকে বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের হিসাব দেয়া হয়। চা শিল্পের উন্নতি ও তার আয় বাড়ানোর জন্য, মালিকদের নানান প্রকার ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু এ চা বাগানগুলোকে কেন্দ্র করে যে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠি দিনের পর দিন দগ্ধ হয়েছে, শোষণের ঘায়ে ক্ষত হচ্ছে তাদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কিছু বলা হয় না। এই চা জনগোষ্ঠির পাচ লাখ চা শ্রমিকের তালিকায় আছেন।

কাগজপত্রে বিধিমালায় চা শ্রমিকদের নানান সুবিধার কথা বলা হলেও বাস্তবে তার দেখা নেই। বাস্তবে চা বাগানগুলো এক আলাদা জগৎ। চা বাগান ব্যবস্থাপনা ও তাদের আচার-আচরণে বৃটিশ ঔপনিবেশিক যুগের ছাপ স্পষ্ট।

কলেজ রোড, শ্রীমঙ্গল থেকে

পাত্রখোলা বাগানে

– মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান শিপন

অনার্স পরীক্ষা দেয়ার পর স্বভাবতই তেমন কাজ ছিল না। দৈনিক পত্রিকা দেখতাম আর চাকরির বিজ্ঞাপন খুজতাম। বাছবিচার না করে সমানে দরখাস্ত করে যেতাম। কোনোটার ইন্টারভিউ কার্ড আসতো, কোনোটার আসতো না।

চা বাগানের সহকারী ব্যবস্থাপক পদে একটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে কৌতূহলবশত দরখাস্ত পাঠালাম। লিখিত পরীক্ষার কার্ড যখন এলো ততোদিনে মাস্টার্স পরীক্ষা হয়ে গেছে। যখন ভাইভা কার্ড এলো, ইতিমধ্যে একটা চাকরি জুটে গেছে ঢাকা শহরেই।

নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে তো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দীর্ঘ দিন ঢাকা ঢাকার পর চলে যেতে হবে নির্জন দূর দেশে। যার কাছে পরামর্শের জন্য যাই, লোভনীয় সব সুযোগ সুবিধার কথা বলে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করেন। শেষ পর্যন্ত যোগ দিলাম। পোস্টিং দেয়া হলো হবিগঞ্জের জগদীশপুর চা বাগানে।

চা বাগান সম্পর্কে সামান্য ধারণা আগে থেকে ছিল। ইউনিভার্সিটি থেকে একবার শিক্ষা সফরে গিয়েছিলাম। তখন শুধু দেখেছি ম্যানেজারের আলিশান বাংলো এবং চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। নির্জন পরিবেশ আর শত প্রতিকূলতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই তখন ছিল না। ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমেই দেখলাম বাগানের গাড়ি হাজির। একজন স্টাফ এসেছেন রিসিভ করতে। সরাসরি গেলাম ম্যানেজারের বাংলোয়। বাংলোর ব্যালকনিতে বসতে না বসতেই বিকট ও কর্কশ এক প্রাণীর ডাকে প্রথমত ভয় পেয়ে গেলাম।

বাংলোর বেয়ারা বললো, এটা ককেকো সাপ। বাংলোতেই থাকে। কোনো ক্ষতি করে না। টানা এগারোবার বিকট শব্দে ডেকে থেমে যায়।

ঢুকলাম টয়লেটে। কমোডের সামনে দাড়িয়ে প্যান্টের জিপার খুলতেই দেখি বড় এক সাপ কমোডের ওপর ফণা ধরে বসে আছে। গা শিউরে উঠলো। বাগানে বড় বড় সাপ আছে শুনেছি। কিন্তু বাংলোর ভেতর হাই কমোডের ওপর এই অবস্থায় দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। দৌড়ে বাইরে গিয়ে বেয়ারাকে বললাম।

শেষে লাঠি দিয়ে মারা হলো সাপটাকে। এই রকম একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্য দিয়েই শুরু হলো ম্যানেজারের চাকরি। তিন বছরে ঘটেছে আরো ভয়ঙ্কর সব অভিজ্ঞতা যা আজ শুধুই স্মৃতি।

বাগানের ম্যানেজার বা বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। কুশল বিনিময়ের পর বাগানের বিভিন্ন নিয়ম–কানুন সম্পর্কে ধারণা দিলেন। আসলে চা বাগানগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। এখানকার সব নিয়ম–কানুনই আলাদা, অনেকটা বৃটিশ স্টাইলের প্রশাসন ব্যবস্থা এখানে।

আমি হলাম বাগানের ছোট সাহেব। ছোট সাহেব একাধিক হলে যিনি ফিল্ড দেখেন তিনি হলেন *টিলা সাহেব* আর যিনি ফ্যাক্টরির দায়িত্বে থাকেন তিনি হলেন *মিস্ত্রি সাহেব*। বাগানের শ্রমিকদের কাছে সাহেবরা এ নামেই পরিচিত। বাগানে যেসব স্টাফ রয়েছেন তাদের অফিশিয়াল পদবি যদিও ক্লার্ক, তারা *বাবু* নামেই পরিচিত। বাবুরাই সর্দারদের মাধ্যমে কাজ করান। ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজার নীতি–নির্ধারণ ও সার্বিক দেখাশোনার কাজ করেন।

বড় সাহেব বললেন ভোর ছয়টায় হাফপ্যান্ট পরে অফিসে যেতে হবে মাস্টারিং (Mustering) করতে।

আগের দিনের কাজের মূল্যায়ন ও ওইদিনের কাজের প্রোগ্রাম তৈরি করে বাবু ও সর্দারদের জানিয়ে দেয়া হয় মাস্টারিংয়ে।

শীতের সকাল। এমনিতে আটটার আগে ঘুম ভাঙে না। বাংলোর চৌকিদার ভোরে ডেকে দিল।

ঘুমের মধ্যেই চোখ বুজে হেটে হেটে অফিস পর্যন্ত পৌছালাম। এতো ভোরে ঘুম থেকে ওঠার কষ্ট এখনো ভুলতে পারি না। হাফপ্যান্ট পরে এই শীতে যে কি অবস্থা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। গায়ে মোটা সোয়েটার বা জ্যাকেট যাই থাকুক, নিচে হাফপ্যান্ট পরতে হবে। কারণ এটা হলো সাহেবদের পোশাক।

সকালের নাশতা সেরে বের হলাম বাগানের বিভিন্ন সেকশন দেখতে। গায়ে শাদা টি–শার্ট, পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে মোজা, কেডস আর মাথায় ক্যাপ যাকে বলে সাহেবি পোশাক। বাগানের সাহেব অর্থাৎ ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজাররাই কেবল মাথায় ক্যাপ কিংবা হ্যাট পরতে পারে। অন্য যে কারো জন্য পরা এক রকম অন্যায়। বয়স কম এবং হাফপ্যান্ট, কেডস পরে থাকায় আমাকে অনেকটা স্কুলে ছাত্র মনে হচ্ছিল।

নতুন সাহেব দেখে মাঠের শ্রমিকরা, বিশেষ করে মহিলারা ঠাট্টা করে নাম দিল *বাচ্চা সাহেব*।

ছোট টিলায় বাগানের মধ্যে অলিতে–গলিতে মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে প্রথম খুব ভালোই লাগতো। চা শ্রমিকদের আদি বাসস্থান, বাংলাদেশে আগমন, তাদের ভাষা সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে কৌতূহল বাড়তে থাকলো। রাতের বেলায় বেয়ারা ও চৌকিদারদের নিয়ে যেতাম শ্রমিকদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, উপজাতিদের বিয়ে ও ঝুমুর নাচ দেখতে। শুনতাম সাওতাল মেয়েদের জাদু বা বানমারা শেখা ও তা প্রয়োগের বিভিন্ন কাহিনী।

চা বাগানে চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে মৌলভীবাজারের পাত্রখোলা বাগানে। বাংলাদেশের বড় বাগানগুলোর মধ্যে এটি একটি। আয়তন সব মিলিয়ে এক হাজার নয়শ হেক্টর। বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল দশ লাখ কেজি চা। এখানে আমি ছিলাম মূলত মিস্ত্রি সাহেব। মেশিনের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে থাকতে থাকতে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সীমিত গণ্ডির মধ্যে জীবনকে মাঝে মধ্যে খুব বোরিং মনে হতো। তবে দেশি–বিদেশি অনেক পর্যটক আসতো ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে। চা তৈরির বিষয়ে আলাপ করতে গিয়ে নিঃসঙ্গতা কিছুটা দূর হতো। আমেরিকান, বৃটিশ, জার্মান ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যটকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ফ্যাক্টরিতে। অনেক নাটক, সিনেমার শুটিংও হয়েছে এখানে। পিক সিজনে চব্বিশ ঘণ্টা ফ্যাক্টরি চলতো।

ফ্যাক্টরিতে বসে বিনিদ্র কাটিয়ে দিয়েছি বহু রাত। এই নির্জন–নিঃসঙ্গ রাতগুলোতে প্রায়ই আমাকে সঙ্গ দিয়েছে জনৈক মোবাইলওয়ালী। সুদূর ঢাকায় থেকেও আমার সঙ্গে গভীর রাতে পাহারা দিয়ে গেছে ফ্যাক্টরি এবং আমার ক্লান্তি অনেকখানি দূর করেছে।

চায়ের কোয়ালিটি রক্ষার চেয়ে চুরি বন্ধ করাই ছিল রাত জেগে ডিউটি করার মূল উদ্দেশ্য। চুরি কতো প্রকার ও কি কি তা ফ্যাক্টরিতে ডিউটি করতে গিয়েই শিখেছি। একজন শ্রমিক আট ঘণ্টা কাজ করে পায় আটাশ টাকা। এক কেজি চা চুরি করলে পায় ষাট টাকা। স্বাভাবিকভাবে কাজের চেয়ে চুরির প্রতিই থাকে তাদের আগ্রহ। শুধু চা চুরি নয়, ছায়াগাছ চুরি আরেক সমস্যা।

বিডিআর নিয়ে বহুরাত সেকশন পাহারা দিয়েছি। মাইলের পর মাইল চোর দাবড়িয়েছি। অনেক চোরকে নিজ হাতে পেটাতেও হয়েছে।

রবিবার বাগানের সাপ্তাহিক ছুটি। বৃটিশ আমল থেকেই এটা চলে আসছে। বাগানে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, বাগান চলে দস্তরে অর্থাৎ প্রচলিত নিয়মই এখানকার আইন। কোনো পরিবর্তনই শ্রমিকদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সাপ্তাহিক ছুটি রবিবারেই রয়ে গেছে। ছুটির দিনেই সাধারণত বাইরে যেতাম। ত্রিশ বত্রিশ কিলোমিটার দূরে যেতে হতো বাজার করতে। কারণ স্থানীয় বাজারে সাহেবদের যাওয়া নিষেধ।

স্থানীয় যানবাহন, রিকশা, টেম্পো বা বাসে সাহেবরা চড়তে পারে না। নিজস্ব মোটর সাইকেল বা জিপ নিয়েই যেতে হতো। আশপাশের বাগানে সহকর্মীদের বাংলোতে গিয়ে আড্ডা দিতাম এ ছুটির দিনেই। কারণ সাহেবরা কেবল অন্য সাহেবদের বাংলোতেই যেতে পারে। স্টাফ বা শ্রমিক কারো সঙ্গে মিশতেও পারে না, কারো বাসায় যেতেও পারে না।

তবে আমরা উদগ্রীব থাকতাম ক্লাব ডে–তে ক্লাবে যাওয়ার জন্য। সপ্তাহে দুই দিন ক্লাব ডে। আশপাশের সব বাগানের ম্যানেজার ও ভাবীরা আসতেন ক্লাবে। লন টেনিসসহ সব খেলাধুলা ও আড্ডা চলতো অনেক রাত পর্যন্ত। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন বাংলোতে পার্টি হতো। ৩১ ডিসেম্বর রাতের পার্টি হতো জমকালো নিউ ইয়ার ইভ পার্টি। সব বাগানের ম্যানেজার ও ভাবীরা আসতেন। ড্রামের তালে বল নাচ আর নামি–দামি মদ এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ। বৃটিশ সাহেবদের ধারাবাহিকতা চলে এসেছে এখানেও।

চা বাগানে চাকরি করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই কোনো না কোনো সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। মেশিনারির সমস্যা, ইলেকট্রিসিটি সমস্যা, জেনারেটেরের সমস্যা লেগেই থাকতো। তিন দিন ধরে ইলেকট্রিসিটি নেই,

গুদামে তেল নেই, হাজার হাজার কেজি পাতা পচে যাচ্ছে – এ ধরনের সমস্যা ছিল নিয়মিত। চায়ের কোয়ালিটি খারাপ। অকশনে প্রাইস কম। ফ্যাক্টরিতে স্টক শর্ট এবং শ্রমিকদের সৃষ্ট হাজারও সমস্যা নিয়ে সব সময় টেনশনে কাটতো।

অন্যদিকে ফিল্ডে প্রচণ্ড রোদে মাইলের পর মাইল ঘুরেছি। বৃষ্টির মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভিজেছি। মশার কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের স্বাদও পেয়েছি।

এতো সব ঝামেলার মধ্যেও নতুন অনেক কিছু দেখা ও জানার সুযোগ হয়েছে বাগানে। চৈত্র সংক্রান্তিতে *চড়ক পূজা* হতো বাগানে। পিঠে বড়শি গেথে চড়কে ঘোরা, জিভের একপাশ থেকে অন্যপাশে তার ঢোকানো, জীবন্ত মানুষ কবর দেয়া দেখে প্রথম গা শিউরে উঠতো। তাকাতে পারতাম না। পরে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। দুর্গা পূজায় বসতো কয়েক রাত ধরে যাত্রাগান। সারারাত মোটর সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন বাগানে ঘুরে ঘুরে উপভোগ করতাম। অগ্রহায়ণ মাসে বসত মণিপুরিদের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান রাসমেলা। সারা রাত কাটিয়েছি মণিপুরি রাসলীলা নৃত্য ও মেলা দেখে। লালপূজা, রঙ খেলা, বর্ণদেবীর পূজাসহ অসংখ্য অনুষ্ঠান দেখেছি বাগানে।

বিশাল বাংলো, দশ বারোজন ব্যক্তিগত চাকর, সরকারি গাড়ি, আকর্ষণীয় বেতন ইত্যাদি সুযোগ–সুবিধা সত্ত্বেও নিঃসঙ্গতা ও অজস্র সমস্যার কারণে প্রথম থেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম। ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছিলাম অন্য চাকরির। বাংলোতে আমার ইউনিভার্সিটি শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যেই গিয়েছেন সবাই বাগানের সুযোগ–সুবিধা দেখে আমাকে বাগানেই থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু কোনো যুক্তিই মানতে চাইনি।

বিসিএস–এর রেজাল্ট হলো।

তিন বছরের ম্যানেজারি জীবনের অবসান ঘটিয়ে চলে এলাম।

চা বাগানের সে সব দিনগুলো আজ শুধুই স্মৃতি।

বাগেরহাট থেকে

বিটি সিক্রটিন

– সৈয়দ মাহমুদ হোসেন

দ্বিবীজপত্রী গুপ্তবীজি সপুস্পক উদ্ভিদ গ্রুপের Theas বর্গের Theaceae গোত্রের Camellia = (Thea) Sinensis নামের প্রজাতির প্রায় দশ মিটার উচ্চতার, চিরসবুজ একটি বৃক্ষ ও তার পাতা থেকে তৈরি কোমল পানীয় দ্রব্য *চা* নামে পরিচিত। চা গাছ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার চায়নার দক্ষিণ–পশ্চিম ইউনান, উত্তর ইন্দো চায়না, উত্তর মায়ানমার, উত্তর–পূর্ব ভারতবর্ষসহ স্থানীয় প্রজাতি। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় উষ্ণ–আর্দ্র অঞ্চলে যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাত নব্বই ইঞ্চি থেকে দুইশ ইঞ্চি (দুই হাজার দুইশ থেকে পাচ হাজার মিলিমিটার), অথচ বৃষ্টির পানি জমে না সেসব স্থান চা গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। সাধারণত পাহাড়ি এলাকার পাদদেশ (পঞ্চাশ থেকে একশ মিটার) থেকে দুইশ মিটার উচ্চতার পাহাড়ে ভালো চা জন্মায়। চায়না, জাপান, তাইওয়ান, উত্তর ও দক্ষিণ ইনডিয়া, শ্রী লংকা, ইন্দোনেশিয়া, পূর্ব আফৃকা এবং বাংলাদেশ চা উৎপাদক দেশ হিসেবে সুপরিচিত। অমাদক জাতীয় (NonAlcoholic) পানীয় হিসেবে চায়ের ব্যবহার শুরু হয় আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে চায়নায়। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে এটি একটি অন্যতম প্রধান কোমল পানীয় রূপে (Soft Drinks) পরিচিত। বাংলাদেশের সিলেটে ও চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় চা চাষ শুরু হয় প্রায় দুইশ বছর আগে। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম চা–কে পানীয় হিসেবে পরিচিত করেছে চায়না। দক্ষিণ চায়নার স্থানীয় জনসাধারণের

উচ্চারিত *টে* (Tay) শব্দটি পর্যাক্রমে Tea বা চায়ে রূপান্তরিত হয়ে আঠারো শতকের প্রথমার্ধে। ইওরোপ মহাদেশে চায়ের ব্যবহার শুরু হয় সতেরো শতকে।

বাণিজ্যিকভাবে চা প্রধানত তিন প্রকার।

এক. কালো বা গ্যাজানো চা (Black or fermented tea)।

দুই. সবুজ বা অগ্যাজানো চা

তিন. আধা গ্যাজানো চা।

এদের মধ্যে Black Tea বা 'র' চায়ের চাহিদা অধিক। চারটি ধাপের মাধ্যমে এ ধরনের চা প্রস্তুত করতে হয়। যেমন – ক. শুকানো, খ. রোলিং, গ. গ্যাজানো, ঘ ফায়ারিং বা অধিক উত্তাপে শুকানো। এসব পদ্ধতির শেষে বিভিন্ন আকারের বা গোত্রের চা ছোট করা হয়। যেমন Orange Pekoe, Pekoe, Fannings ও Dust বা গুড়া চা।

গুণের দিক দিয়ে প্রধানত দুই রকম চা তৈরি হয়। *এক.* সুঘ্রাণযুক্ত (Orange Pekoe) এবং *দুই.* উজ্জ্বল রঙ প্রদানকারী উপকরণ। এদের মধ্যে মিশ্রণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক ব্র্যান্ড বাজারজাত করা হয়। চা–কে আমরা সহজলভ্য মনে করি। কিন্তু এর উৎপাদনের পেছনে আছে বহু লোকের কষ্টসাধ্য পরিশ্রম, বিজ্ঞানীদের গবেষণা, মিশ্রণকারীদের দক্ষতা, ব্যবসায়ীদের ধীশক্তি, যত্ন ও তৎপরতা এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের সৌজন্য। চারা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছাতে নানান ধাপ পার হতে হয় এবং বহু লোকের হাত ও বহু পথ ধরে এবং সাগর, নদী পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌছে যায় পৃথিবীর আনাচে–কানাচে। বর্তমান সভ্যতায় পৃথিবী জুড়ে চা একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে যা দুই তিন শতাব্দী আগেও কেউ ভাবতে পারেনি। বাংলাদেশসহ অনেক দেশে ব্ল্যাক চায়ের সঙ্গে দুধ, চিনি মিশিয়ে খাওয়া হয়। কিন্তু ভালো সুগন্ধি চা এসব উপকরণ ছাড়াই বহু লোক খেয়ে থাকে। ইরান ও আফগানিস্তানে সবুজ চা এবং চায়না ও জাপানে হালকা রঙের চা দুধ, চিনি ছাড়াই খাওয়া হয়। চায়নায় টাটকা পাতার সঙ্গে বেলি ফুলের পাপড়ি মিশিয়ে সুগন্ধযুক্ত *জেসমিন টি* বাজারজাত করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ছয় কোটি কেজি চা উৎপাদিত হয়। সিংহ ভাগ দেশের ভেতরেই ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চায়ের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। এর প্রেক্ষিতে দীর্ঘ দিন ধরে চা গবেষকরা অধিক ফলনশীল চা উৎপাদনের জন্য কাজ করছেন।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ চা গবেষণা ইন্সটিটিউট নতুন জাতের চা উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছে। ক্লোন পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত এই জাতের উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণ জাতের দ্বিগুণেরও বেশি। গবেষকরা জাতটির নাম দিয়েছেন বিটি সিক্সটিন (BT Sixteen)। গবেষণকরা ইতিমধ্যেই দেশের বেশ কয়েকটি চা বাগানে এ জাতের চারা সরবরাহ করেছেন। কয়েকটি বাগানে চারা লাগানো হয়েছে। তারা আশা করছেন, এ জাত উদ্ভাবনের ফলে চা উৎপাদন ও রফতানিতে জোয়ার আসবে। শুধু উৎপাদনই বেশি হবে না, এ জাতের চায়ের স্বাদ হবে কড়া, লিকার হবে ঘন।

ঢাকা থেকে

চা Cha এবং Tea-র গল্প

– এস.এম মাহফুজুল হক

চা

আমার জন্ম চায়ের দেশ বাংলাদেশে। চায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেই ছেলেবেলা থেকেই। আমার মা শহরের মানুষ হয়েও কখনো চা বানাননি। চা বানাতে পারতেন না। চা খেতেনও না। তাই বাসায় কোনো অতিথি এলে চা বানানোর পর্বটা আমার কাধে পড়তো।

সেই থেকে শুরু। লাল চা, দুধ চা, লেবু চা, আদা চা, কখনো বা কারো শরীর খারাপ হলে (ঠাণ্ডা সর্দি, কাশি) তেজপাতার ডাল এবং লবঙ্গ চা। তখন চা পাতা (গুড়া চা)-র প্রচলনই ছিল বেশি।

বাসায় ছিল চায়ের ছাকনি। ছোট প্লাস্টিকের তৈরি। আজকের মতো চায়ের ব্যাগ ছিল মূলত স্বল্প পরিসরে সভা-সমিতির জন্য।

Cha

কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে পা দিতেই দেশান্তরী হই। স্কুলে বাংলা ব্যাকরণে পড়েছিলাম, চা হলো চায়নিজ শব্দ। মনে মনে খুশি ছিলাম এই ভেবে, আমি একটি চায়নিজ শব্দ জানি। কিন্তু সেদিন চায়না গিয়ে চা পাইনি। যা পেলাম তা হলো Cha (চায়নিজ ভাষায় উচ্চারণ *ছা*) যা খেলাম, মনে হলো থু করে তক্ষুনি ফেলে দিই। কি অসম্ভব বিস্বাদ! কষ! আমার বাংলা চা, এই চায়নিজ Cha-র কাছে অমৃত যেন।

এরপর ধীরে ধীরে জানলাম, এই Cha-র মাহাত্ম্য। এটা হলো সবুজ চা, আমাদের দেশের মতো গুড়া চা নয়। এটা একেবারে আস্ত শুকনো চা পাতা। যদি উন্নতমানের দামি চা হয় তাহলে গরম পানিতে ভেজালে চা পাতাগুলো সতেজ হয়ে ওঠে। সেই সময়ে দেখেছি বাড়ি, অফিস, এমনকি বাস বা ট্যাকসি ড্রাইভারের সিটের পাশে থাকতো একটা কাচের বৈয়ম। সকালে তাতে এক মুঠো চা পাতা দিয়েই শেষ। সারা দিন শুধু গরম পানি ঢালা আর চুমুক দেয়া। পর দিন পুরনো পাতা ফেলে দিয়ে আবার নতুন পাতা দেয়া। ব্যাস! নেই দুধ বা চিনির সামান্যতম আয়োজন। অবশ্য শুকনো জেসমিন ফুল দিতে দেখেছি একটু উচ্চবিত্ত বা অভিজাত পরিবেশে।

তবে সেনেগালের কিছু বন্ধু ছিল যারা এই সবুজ চা খেতো শুধু চিনি মিশিয়ে। এটা নাকি তাদের দেশের প্রচলন। দক্ষিণের কিছু অংশ বাদ দিলে সারা চায়নায় শীতের ব্যাপ্তি দীর্ঘ ও প্রকট। তাই চায়নিজদের এই চা খাওয়া চলে সারা বছর ধরেই।

যে সময়কার কথা বলছি (১৯৯১-৯৬) সে সময় কোনো আগন্তুক বাসায় এলে চায়নিজ পরিবার তাকে বসতে দিয়ে প্রথমে নিয়ে আসতো এক মগ গরম পানি। প্রসঙ্গত. চায়নায় চীনা মাটির তৈরি নকশা কাটা সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ঢাকনিযুক্ত মগের ব্যবহারই বেশি এবং জিজ্ঞাসা করতো চা পাতা দেবো কি না। এটা ছিল চায়নিজদের খুব সাধারণ একটা আতিথেয়তা।

মজার কথা হলো, এই বাঙালি জামাইবাবুকেও শ্বশুরবাড়ির বৈঠকখানায় বসে গ্রীষ্মের ভরা তাপদাহের মাঝে এই Cha দিয়েই শুকনো গলা ভেজাতে হয়েছিল বার বার। সেটা ছিল ১৯৯৬ সালের জুলাই মাসের কোনো এক দিন। দুপুর গড়িয়ে তখন বিকেল।

পাচ বছর ছিলাম চায়নায়। চায়না সুন্দরীকে আপন করেছি। কিন্তু তাদের Cha-কে আপন করতে পারিনি আজও।

Cha পর্বটা শেষ করার আগে আমার Cha সুন্দরীর চা বানানোর গল্পটা বলা যাক। সে তখন ঢাকায়। আমার ঘরণী হয়ে বাঙালি ঘরকন্না করছিল শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে।

একদিন সন্ধ্যায় বাসায় অতিথি এসেছে। আমি ছিলাম বাইরে। ফলে স্বেচ্ছায় নাকি শ্বশুরের ইচ্ছায় আমার Cha প্রস্তুতকারী স্ত্রী গেল প্রথমবারের মতো চা প্রস্তুত করতে। ভাবলো এ আর এমন কঠিন কি! দুধ ও চিনি দিলেই তো হলো। সে চা বানাচ্ছে। কিন্তু চায়ের রঙটা কিছুতেই ঠিক মতো হচ্ছে না। কারণটা কি? শেষে আমার বাবাকে ডাকলো।

বাবা এসে কথা বলে যা বুঝলেন তা হলো, সে পানি নয়, চুলায় শুধু দুধ ফুটিয়েই চা পাতা দিয়েছে মনের মতো। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। চায়ের সেই গাঢ় লাল বর্ণ সহজে হচ্ছে না।

রাতে আমি বাসায় ফিরলে আরেক দফা হাসির রোল উঠলো এই ঘটনা রিওয়াইন্ড করে।

পরে এই Cha পানকারী খুব পছন্দ করেছিল সিলেট শহরের মদিনা মার্কেট এলাকার সাধারণ এক রেস্টুরেন্টের অসাধারণ এক চা। চাকরির সুবাদে আমরা তখন ঢাকা ছেড়ে সিলেটবাসী। আমার ধারণা, এই চায়ে চিনির বদলে দেয়া হতো গুড়। এ জন্য রঙটা হতো চমৎকার। ঘন মাটির মতো।

তবে আমার মনে পড়ে ময়মনসিংহ শহরের শম্ভুগঞ্জ বৃজের নিচের এক চা আস্তানার কথা। সেটা ছিল ১৯৯৪ সাল। আমার বন্ধু Capt কাওসার তখন মেডিকাল কলেজের ছাত্র। আমি ছুটিতে দেশে এসেছি বেড়াতে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সারা দিন ঘুরলাম ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে।

এক সময় বন্ধু বললো, চল তোদের মৈত্রী সেতু দেখে আসি, আর দারুণ চাও খেয়ে আসি।

বললাম, বেশ তো।

বৃজটা ছিল চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু। যেহেতু চায়নার খেয়ে চায়নায় পড়াশোনা করছিলাম, তাই সে এক মধু মিশ্রিত খোচা দিল ওটা আমাদের সেতু বলে।

আমরা সেতু এলাকায় ঘুরলাম। ছবি তুললাম চায়নিজ ভাষায় খচিত ভিত্তিপ্রস্তরটির। উদ্দেশ্য, ফিরে গিয়ে আমার চায়নিজ বন্ধুদেরকে দেখানো। বিশেষ করে তাকে, আর এটা বোঝানো, শুধু তোমাতে-আমাতেই নয়। বাংলাদেশের মধ্যে চায়না আছে অনেক, অনেক সুগভীর বন্ধুত্ব। এরপর আমরা গেলাম বৃজের অপর পাশে নিচের দিকটায়, মুকুলের চা আস্তানায়। সেটা ছিল সত্যিই অপূর্ব এক চা। আমরা কয়েক কাপ খেলাম।

অবশেষে আবিষ্কার করলাম চায়ের অপূর্ব স্বাদের কারণ। যে দুধটা দিয়ে চা তৈরি করা হচ্ছিল সেটা ছিল এলাচদানা মেশানো অনেক সময় ধরে জ্বাল দেয়া ঘন খাটি গরুর দুধ। আরো জানলাম, এই আস্তানায় শুধু চাখোররাই আসে না। অন্য নেশাখোররাও আসে। আস্তানার পেছন দিকটায় বসে তাদের আসর। তাই আমরা বেশি দেরি না করে তাড়াতাড়ি কেটে পড়লাম। শেষে আবার কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়!

Tea

এখন আমি আছি Tea-র দেশে। আয়ারল্যান্ডে। এখানে পাওয়া যায় হরেক রকমের Tea। প্রচলিত Red Tea-র সঙ্গে রয়েছে Peppermint Tea, Jasmine Tea, Green Tea, Lemon Tea, Vanilla Tea। আরো আছে Herbal Tea এবং বিভিন্ন ফলের স্বাদযুক্ত Fruit Tea।

বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় Raspberry Tea। Red Tea ছাড়া অন্য কোনো Tea-র সঙ্গে দুধ মেশাতে হয় না। তবে একটু চিনি দেয়া যেতে পারে।

ডাবলিন থেকে

smmh1999@yahoo.co.uk

এসএমএস

– শামসুল আলম

কিছুদিন আগে বর্তমান কর্মস্থলে থাকা অবস্থায় চা নিয়ে ছোট একটি মজার ঘটনা ঘটে। আমি চায়ের জন্য দোকানে গেছি, এমন সময় মোবাইলে এসএমএস-এর রিং বেজে উঠলো।

চা নিয়ে দোকানে ফিরে এসএমএস চেক করে দেখি তাতে লেখা, *প্রিয় শামসু, আমার জন্য দয়া করে একটু চা নিয়ে এসো*।

এসএমএসকারী আর কেউ নয়, আমার পাশের দোকানদার বকুলভাই যাকে আমরা *মন্ত্রী* বলে ডাকি।

এখানে মজার ব্যাপার হলো, বকুলভাই জানেন না চায়ের জন্য দোকানে গেছি আর আমিও জানি না তিনিই চায়ের জন্য এসএমএস করেছেন। কাকতালীয়ভাবে মিলে যাওয়াতে সেদিন দুজনে ভীষণ আনন্দ করে চা ভাগ করে তৃপ্তি সহকারে খাই।

জেদ্দা, সউদি আরব থেকে

পনেরো মিনিট ছুটি!

– রাশেদ বিন কালাম

১৯৯৯ সালে আমি যখন কাতারে আসি তখন ছিল সেপ্টেম্বর মাস। অনেক গরম, তার উপর জীবনের প্রথম চাকরি। দেশে থাকতে কখনো কষ্টের ভয়ে বাজারে যাইনি। সে আমি প্রথমে চাকরি নিলাম Food Stuff Shop (মুদির দোকান)–এ। এখানে প্রচুর ব্যবসা হয় এ ধরনের দোকানে। সকাল সাতটা থেকে একটা এবং দুপুর তিনটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়। একে তো নতুন, তার ওপর কাজ না জানার জন্য মালিক পক্ষের নানান কথা শুনতে শুনতে অনেকটা বিব্রত হয়ে পড়লাম। সবচেয়ে বেশি ইনসাল্টেড হয়েছি এক কাপ চা খাওয়া নিয়ে।

এখানে দুপুরে কাজে যোগ দিয়ে সামান্য কিছু হাতের কাজ করে প্রায় প্রতিদিনই ছুটে যেতাম চায়ের দোকানে। যতো দ্রুত সম্ভব চা খেয়ে ফেরত আসতাম কর্মস্থলে। সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। দোকানদার চা দিতে দেরি করেছিল। তাই পাচ মিনিটের মতো দেরি হলো আর তাতেই হয়ে গেল এক লঙ্কাকাণ্ড। দোকানের মালিক আমাকে অনেক কথা শুনালেন। এমন সব বাক্য উচ্চারণ করলেন যা কি না লিখতে আমার লজ্জা হচ্ছে।

অসহায়ের মতো দাড়িয়ে তার কথা শুনলাম। প্রতিবাদের কোনো ভাষাই নেই, নেই কোনো সুযোগ। শুধু দুচোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো। এভাবে অনেকক্ষণ দাড়িয়ে তার কথা শুনতে শুনতে এক সময় অনেকটা বিরক্ত হয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। চলে গেলাম আমার পাশের দোকানে যেখানে হারুনমামা থাকতেন। তিনি আমার সঙ্গে বসে একই সময়ে চা খেয়েছিলেন। তাকে সব ঘটনা খুলে বললাম। তখনো আমার চোখে পানি।

তিনি সব কথা শুনলেন, সান্ত্বনা দিলেন। আমাকে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার পরামর্শ দিলেন।

সামান্য দেরির জন্য এতো কথা শুনতে হলো তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না। অপমানে, ক্ষোভে আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছিল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলিয়ে আবার কাজে যোগ দিলাম। তবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনো দিন চা খাবো না।

এভাবে বেশ কিছুদিন চা খাইনি। তবে দুপুরে দশ মিনিট ও সন্ধ্যায় পনেরো মিনিট চায়ের ছুটিতে কখনো সিড়ি ঘরের তিন তলায় অথবা মার্কেটের সামান্য বাইরে নির্জন স্থানে বসে সময় কাটাতাম। নিজের ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করতাম অনেক সময়। মা, বাবা, ভাই, বোন, কাছের আত্মীয়সহ সবচেয়ে প্রিয় মানুষটির ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতো। পুরনো স্মৃতি মনে করে চোখের পানি ছাড়া অবশিষ্ট কিছুই থাকতো না। পনেরো মিনিট শেষ হলে আবার কর্মস্থলে যোগ দিতাম। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

প্রায় প্রতিদিনই আমি অপেক্ষা করতাম সন্ধ্যার পনেরো মিনিট চায়ের ছুটির জন্য। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার কাজ, দক্ষতা ও নিষ্ঠার জন্য আজ আমিই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছি।

বর্তমানে এখানে আমরা বন্ধুরা মিলে রাতে দোকান বন্ধ করে আসা–যাওয়ায় প্রায় পচিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে যাই এক কাপ চা খেতে। আমাদের কর্মস্থল থেকে প্রায় পচিশ কিলোমিটার দূরে দোহা এয়ারপোর্ট সংলগ্ন থালি নামের একটি নামকরা চায়ের দোকান আছে। দোকানে চায়ের দাম এক রিয়াল। সেখানে (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় সতেরো টাকা ত্রিশ পয়সা)। এই চাকে *খুচুজি* বা স্পেশাল চা বলে। এখানে

সব চায়ের দোকানে চা বিক্রি হয় দশমিক পঞ্চাশ রিয়াল মানে বাংলাদেশি টাকায় সাড়ে আট টাকা প্রায়। তবে থালির চা অন্য চায়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

বিশেষ করে রাতে এখানে প্রচুর যুবকের সমাগম হয়। আসল উদ্দেশ্য সবাই মিলে কিছু সময় আড্ডা দেয়া। তাই প্রায় সময় আমি, ইন্টারনেট রাজু, মাফিয়া মানিক, মিলিয়ন জাবেদ, আলী নূর, তালত আজিম, বিলিয়ন জাবেদসহ অনেক বন্ধুরাই ছুটে যাই থালি রেস্টুরেন্টে।

কিন্তু যখনই চায়ের কাপে হাত লাগাই, আমার সেই এক কাপ চায়ের জন্য মালিকের সামনে নিগৃহীত হওয়ার কথা মনে পড়ে যায়।

অনেক চেষ্টা করেও আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারিনি। প্রতিজ্ঞার পর পরই চা খাওয়া শুরু করেছিলাম অনেক আগে থেকেই। কারণ কর্মব্যস্ততার মাঝে এক কাপ চা আমাকে সব সময় চাঙ্গা করতো।

দোহা, কাতার থেকে
fardin_finding_u@yahoo.com

চিনি ছাড়া

– ছালেহা খানম জুবিলী

বড় চাচা প্রায় এসে বলতেন, মা এক কাপ চা বানিয়ে আনতো, চিনি দিস না। তোর চাচির সঙ্গে আজও চা নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। ঠিক করেছি বাড়িতে আর চা খাবো না। বড় চাচার হাতের লাঠিটা এক পাশে নামিয়ে রেখে দম না ছেড়ে টানা কথাগুলো বলতেন।

বড় চাচা আসার কোনো সময় ছিল না। এই বেলা দশটা কি এগারোটা কিংবা বিকেলে, সন্ধ্যায়। পড়ার টেবিল থেকে উঠে বড় চাচার জন্য চিনি ছাড়া চা বানাতাম, সঙ্গে যৎসামান্য নাশতা দিতাম। তবে খেয়াল রাখতাম সেটা যেন মিষ্টি খাবার না হয়। কারণ তার ডায়াবেটিস ছিল।

মাঝে কিছুদিন তার দেখা নেই। হঠাৎ শুনলাম ভর্তি হয়েছেন বারডেম হাসপাতালে। দেখতে যেতে পারিনি। তার আগেই বড় চাচা লাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। সেই থেকে মন এবং বাড়ির পরিবেশটা কেমন শূন্য শূন্য মনে হতো। মনে হতো কে যেন আবদারের সুরে এক কাপ চা চায় না।

যাই হোক, সে কষ্টের জায়গাটা এক সময় পূরণ করলেন আমার প্রিয় আব্বা।

আব্বা ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যস্ততার কারণে আব্বাকে খুব একটা বেশি সময় কাছে পাওয়া যেতো না। তাছাড়া যে সময়ে আব্বা বাসায়, আমরা ভাইবোনেরা সে সময়ে হয়তো স্কুল কলেজে নিজেদের কাজে ব্যস্ত। আব্বার খুব একটা চায়ের অভ্যাস ছিল না। কিন্তু বড় চাচা চলে যাওয়ার পর দেখেছি আব্বা বিকেলে এক কাপ চা খেতেন। সঙ্গে সরিষা সামান্য। মচমচে মুড়ি মাখানো আব্বার খুবই পছন্দ ছিল।

মা সারা দিন সংসারের নানান ঝামেলা সামলিয়ে বিকেলে চাটুকু বানাতে বড্ড বিরক্ত হতেন। তাই এ কাজটা আমি এবং ছোট বোনটি করতাম। আব্বারও বড় চাচার মতো ডায়াবেটিস ছিল। কিন্তু আব্বা চায়ে সামান্য চিনি খেতেন। এ জন্যও মা মাঝে মধ্যে বকতেন। তারপর আব্বাও একদিন হঠাৎ করে বড় চাচার মতো আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন।

শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর শুনে এসে আর আব্বাকে পেলাম না। বড় চাচা বা আব্বা কেউ এখন এক কাপ চা মুড়ি মাখানো খাবার জন্য আবদার করেন না। এখন মা কাদেন এবং বলেন, তোর আব্বাকে এক কাপ চা বানিয়ে দেয়ার আলসেমিতে কতো বকেছি। কিন্তু সংসারে তো কতো কাজই দুই হাতে সেরেছি।

এখন আমি আমার ছোট্ট সংসারে। এখানে আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী। অধ্যাপক স্বামী, আমি এবং আমাদের একমাত্র পুত্র সন্তান। আব্বা আর বড় চাচার সেই আবদার না থাকলেও এখানে নতুন আবদার এসে ভিড় জমিয়েছে। শান্ত এবং অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের স্বামী আমার যে জিনিসটি চেয়ে খায় তা হলো ওই এক কাপ চা। বিকেলের নাশতায়, ছুটির দিনের অবসরে কিংবা রাত জেগে পড়াশোনা ও পরীক্ষার খাতা দেখার কাজে ক্লান্ত মানুষটি ডাকবে, জুবু, এক কাপ চা করে দাও না।

আমিও খুবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বামীকে চা বানিয়ে দিই সেই একই কায়দায়। কারণ তারও ডায়াবেটিস। তাই চিনি ছাড়া চা। ছেলেটি সকালের নাশতার টেবিলে চিৎকারে দেবে। ছেলেটি তার ইচ্ছা মতো চা গুলে ফেলে আর চামচে বিস্কিট ডুবিয়ে খায়।

আমি ওদের দিকে চেয়ে থাকি, ভাবি আব্বা আর বড় চাচার কথা। পরমজন হারিয়ে আজ যাদের সান্নিধ্যে তারাও আমার পরমজন। একান্তই আপন। তারপরও মাঝে মধ্যে বিষণ্ণতায় ঘিরে ফেলে, চোখ ভরে জল আসে।

মালিবাগ, ঢাকা থেকে

শ্রেণী ও জাতি

আমি চা খাওয়া আরম্ভ করি ১৯৪৪ কি ১৯৪৫ সালে এবং আমার চা খাওয়ার হাতে খড়ি ঘটে আমার নানার হাত ধরে।

পচাশি বছরের নানার মুখে শুনেছি শহরের কাছারির মোড়ে বিশাল পানির ট্যাংকের সম্মুখের মাঠটিতে বৃটিশ কম্পানির মানুষেরা বিনা পয়সায় গরম চা খাওয়ায়। তিনি প্রতিদিন সকালে নাশতা খেয়েই লাইন ধরেন এক কাপ ফৃ চায়ের জন্য। তার ভাষায় খুবই সুস্বাদু সে চা। খেলে শরীর ও মন চাঙা হয়ে ওঠে।

চায়ের লোভে পাচ বছরের আমি একদিন নানার পেছন নিলাম। আমিও চায়ের জন্য লাইনে দাড়ালাম। ছোট বলে কেউ আমাকে লাইন থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল না। ঘোড়ায় টাঙার মতো একটি উচু স্তম্ভ থেকে কাগজের না যেন কাচের ছোট কাপে লাইনের সবাইকে গরম চা দেয়া হয়। আমার পালা এলে আমিও এক কাপ ফৃ চা পেলাম। নানা আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন গরম চা বেশি মুখে দিয়ে মুখ না পোড়াই। চা আস্তে আস্তে চুমুক দিয়ে জোরে আওয়াজ করে মুখে নিতে হয়। এতে চায়ের গরম কমে গিয়ে মুখ সওয়া হয়ে যায়।

নানার কৃপায় সেই পাচ বছরেই আমার চায়ের অভ্যাস গড়ে ওঠে। তখন চায়ের চাঙাকরণ শক্তি বোঝার ক্ষমতা হয়নি। তবে কিছুদিন পর টের পেলাম মহকুমা শহরের ব্যস্ততম জায়গায় গিয়ে বিনা পয়সায় চা খাওয়া একটা অদম্য অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

যতোদিন নানা জীবিত ছিলেন, তার সঙ্গে ফৃ চা খেতাম। এরপর ইংরেজ মহকুমা অফিসারের আর্দালি হিসেবে বাবা বাড়িতে রঙ চা খেতে আরম্ভ করেন। এটা ছিল তখনকার দিনে আভিজাত্যের প্রতীক। আমিও তার কিছু ভাগ পাই। ততোদিনে ফৃ চা খাওয়ানো শেষ হয়ে গেছে। দোকানে চা বিক্রি পুরোদমে চালু হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর কখনো-সখনো দোকানে চা খেতাম। পয়সার অভাবে প্রায়ই আমার চা খাওয়া হয়ে উঠতো না। আস্তে আস্তে চা খাওয়ার অভ্যাস পটল তোলে।

১৯৫৬ সালে কলেজে ভর্তি হলাম। সকাল দশটা থেকে বিকাল পাচটা পর্যন্ত কলেজের ক্লাস। দুপুরে অবস্থাপন্ন সব ছাত্র কলেজ ক্যান্টিনে নাশতাসহ চা খায়। আমার পক্ষে তা সম্ভব হতো না। এক বিকেলে ক্লাসের মিনিট বিশেক আগে এক বন্ধুর আহ্বানে ক্যান্টিনে চা খেতে গেলাম। সারা দিনের ক্লান্তির পর এক কাপ চা খেয়ে

শরীর–মন এতো চাঙা হয়ে উঠলো, ওই প্রথম বুঝতে পারলাম চায়ের চাঙা করার ক্ষমতা। ক্ষিধে–তৃষ্ণা সব উড়ে গিয়ে আবার ভোরের তাজা ফুলের মতো সতেজ হয়ে উঠলাম।

তারপর যেমন করেই হোক দুপুরে কলেজে এক কাপ চা খাওয়ার পয়সা জোগাড় করতাম। বর্তমান প্রেক্ষিতে তা খুবই অপমানজনক উপায়ে। রাতে প্রতিবেশীর জমি চুক্তিতে কোদাল দিয়ে চাষ করে অথবা ডোবা–নালা থেকে মাছ ধরে তা বিক্রি করে। চল্লিশের দশকে নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবন কতো কঠিন ছিল!

নব্বই–এর দশকে আমি একটি দেশের বাংলাদেশি দ্বিতীয় কূটনীতিক। রাষ্ট্রদূত দেশে লম্বা ছুটিতে যাওয়ায় আমি তখন অন্তবর্তীকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত। দূতাবাসের সর্বময় কর্তা। মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি হাকাই। ড্রাইভার স্থানীয় শাদা চামড়ার পর্তুগিজ।

এক বিকেলে সময় কাটাতে ও কিছু কেনা–কাটার জন্য ঢুকলাম এক নাম করা সুপারমার্কেটে। নাম *পাও জি আসুকার* (চিনি মিশ্রিত পাউরুটি)। ব্যাগ হাতে ড্রাইভার আলদু আমার পেছনে। পছন্দের মাছ তরকারি কেনার পর বেরিয়ে আসতে পঞ্চাশ কাউন্টারের একটিতে দাড়ালাম জিনিসের দাম দিতে। আলদু সদাইগুলো মহিলা ক্যাশিয়ারের স্বয়ংক্রিয় ট্রলিতে তুলে দিল।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, এক সুন্দরী তরুণী ট্রলি নিয়ে এগিয়ে এলো কাগজের কাপে ফ্রি চা ঢেলে দেবে কি না জানতে। সেই ছোট বেলার ফ্রি চা খাওয়ার অভ্যাসটি অমিত বিক্রমে চাগা দিয়ে উঠলো। ভুলে গেলাম আমি একজন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত। আলদু–কে বললাম, ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছে, *চা লাও*।

আলদু চা ভর্তি কাগজের কাপ আমার হাতে তুলে দিল। উত্তপ্ত সেই চা এতো ভালো লাগলো, যে সেই মুহূর্তে পঞ্চাশ বাহান্ন বছর আগের নানার সঙ্গে খাওয়া চায়ের তৃপ্তি স্মৃতিতে জাগরুক হলো।

আলদুকে বললাম, তুমিও এক কাপ খাও।

সে তার মাতৃভাষায় জবাব দিল, এ চা গরিব মানুষের জন্য। আমরা এ চা খাই না।

তার উত্তর শুনে আমার মুখের গরম চা লাফ দিয়ে বেরিয়ে আমার সাদা ধবধবে শার্ট–টাইসহ ভিজিয়ে একাকার করে দিল। মনে মনে বললাম, শালা হার্মাদ, তোদের দস্যুতার গল্প নিয়ে আজও আমাদের মায়েরা ছেলে ঘুম পাড়ায় আর এই জংলি দেশে ড্রাইভার হয়ে গেছো বড়লোক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঢাকা থেকে

ইচ্ছাপূরণ

– বুলবুল আহমেদ

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। একদিন বাড়িতে গিয়ে দেখি অপরিচিত জীর্ণদশা এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। লোকটিকে আগে কখনো দেখিনি এবং আমার আত্মীয় বলেও মনে হলো না। মাকে বললাম, মা, লোকটি কে?

মা বললেন, লোকটির বাড়ি পাশের গ্রামে। আপন আত্মীয়স্বজন কেউ না থাকায় এখানে– সেখানে ঘুরে বেড়ান। দূরসম্পর্কের আত্মীয় যারা আছে তাদের কাছে স্থায়ী জায়গা হয় না।

পরে জানলাম লোকটির নাম শামসুদ্দিন। মাথায় একটু সমস্যা থাকার কারণে অনেকে পাগলা শামসুদ্দিন বলে ডাকে।

এরপর থেকে লোকটি মাঝে মধ্যে আমাদের বাড়িতে আসতেন। দুই একদিন থেকে চলে যেতেন। বাড়িতে অবস্থানকালীন লোকটি সারাক্ষণ শুধু বক বক করতেন। কোনো আত্মীয় তাকে কি দিল কোন আত্মীয় জামা–কাপড়, কম্বল ইত্যাদি দিল। এসব নিয়ে সারাক্ষণ বকে যেতেন।

লোকটির ব্যাংকে কয়েকটি একাউন্ট ছিল। মাঝে মধ্যে চেক ও জমাদান বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন এবং মাকে বলতেন, আমার ব্যাংকে অনেক টাকা আছে। তোমাকে কিছু টাকা দেবো ঘরবাড়ি বানাতে।

আমি কাগজপত্র দেখতে চাইলে দেখাতেন না।

লোকটির আবার চা খাবার নেশা ছিল। দৈনিক দুই একবার চা না হলে চলতো না।

একদিন রাত দশটার দিকে ঘুম থেকে উঠে আমাদের কাছে চা খেতে চাইলেন। বাড়িতে চায়ের চল নেই। আমরা পড়লাম মুশকিলে। গ্রামে রাত দশটা মানে নিঝুম রাত, দোকানপাট বন্ধ। তৈরি চা পাওয়া যাবে না। আমরা লোকটিকে কে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। এখন চা পাওয়া যাবে না। লোকটি নাছোড়বান্দা। চা না হলে তার ঘুম হচ্ছে না। চাওয়া মাত্র চা না দিতে পারায় লোকটি মনে মনে গজ গজ করছেন আর বলছেন একটু চা খেতে চাইলাম। তোমরা একটু চা দিলে না, একটু চা হলে ভালো হতো ইত্যাদি।

অগত্যা কি আর করা! পাশের করিম মামার দোকান তখন বন্ধ করছেন। তৈরি চা শেষ। কিছু চাপাতা কিনে এনে আমরা তিন ভাই বোন মিলে চা তৈরি করতে লেগে গেলাম।

চা পেয়ে লোকটি খুব খুশি হলেন। তৃপ্তি সহকারে চা খেলেন আর আমাদের জন্য দোয়া করতে লাগলেন। লোকটির পরিতৃপ্তি দেখে আমাদেরও খুব আনন্দ লাগছিল। চা কেমন হয়েছে জানতে চাইলে বললেন, ভালো ভালো, খুব ভালো।

আজ লোকটি নেই। ওই দিন লোকটিকে চা না দিতে পারলে আজ এ লেখা হতো না। ঘটনাটি যখন স্মরণ করি তখন ভালো লাগে। কারণ ওই দিন ওই বৃদ্ধ লোকটিকে চা দিয়ে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিলাম।

শাহবাগ, ঢাকা থেকে

সেই ছোট্ট ছেলেটি

– তনয় রায়

শীতকালীন ছুটিতে বন্ধু সৈকতের সঙ্গে চলে গেলাম আমার মামার বাড়ি সিলেটে। মামার বাড়ির পাশেই চা বাগান দেখতে দেখতে আমি আর সৈকত হেটে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমরা থমকে দাড়ালাম। একটু দূরেই মনে হচ্ছিল চেচামেচি।

গিয়ে দেখলাম একটি ছোট ছেলেকে সাপে ছোবল দিয়েছে। ছেলেটির নাম আকাশ। বিষাক্ত সাপের ছোবল খেয়ে আকাশ আমাদের ডাক্তারখানায় নেয়ার সুযোগ দেয়নি। মুহূর্তের মধ্যে সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে এবং চিরদিনের জন্য চলে গেল পৃথিবী থেকে।

এ ঘটনা দেখার পর চলে গেলাম বাড়িতে। তখন সন্ধ্যা। যেখানে ঘটনা ঘটেছিল সে জায়গাটা আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যেতো। রাতের খাওয়া শেষ করে আমি আর সৈকত ঘুমাতে গেলাম। জানালাটা বন্ধই ছিল। হঠাৎ রাত বারোটার দিকে ঘুম ভাঙলো। পিপাসা পেয়েছে বলে এক গ্লাস পানি খেয়ে নিলাম। চোখ পড়লো জানালার দিকে। মনে হচ্ছিল চা বাগানটিতে আগুন জ্বলছে। ঘটনা পুরোপুরি জানার জন্য একাই সেখানে যাচ্ছিলাম। সৈকত ঘুমিয়ে ছিল।

যতোই চা বাগানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল আগুনের পরিমাণ ততোই কমছে। শেষ পর্যন্ত যখন মৃত্যুর স্থানটিতে গেলাম তখন দেখলাম সেখানটিতে কোনো আগুনের অস্তিত্ব নেই। দেখলাম সেখানে একটি জোনাকি চা গাছের ওপর বসে আছে। তারপর এক দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে।

সকালে যখন উঠলাম তখন দেখলাম মামি আমার মাথায় পানি ঢালছেন।

সেদিন আমাদের যাওয়ার কথা ছিল ঢাকায়। জ্বরের কারণে আমার যাওয়া হলো না। সৈকতের কাজ থাকায় সেদিন চলে গেল।

পরের দিন অবশ্য আমি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম।

মামা–মামির অনুরোধে আরো তিন দিন থেকেছিলাম।

মামাবাড়ি থাকাকালে একটি ছেলে প্রতিদিন মামার বাড়ি দুধ দিয়ে যেতো। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে সে। বিধবা মা ছেলেটির নাম রেখেছিলেন চন্দন।

একদিন রাতে জানালা দিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছিল। কে কাদে এ ঘটনা না দেখেই ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালে উঠে শুনলাম চন্দন অসুস্থ। সকালের খাওয়াটা শেষ করে দেখতে গেলাম ছেলেটিকে। শরীর দিয়ে যেন আগুন উঠছে চন্দনের। বিধবা মা চন্দনের মাথায় পানি ঢালছেন অবিরাম ধারায়। তবুও জ্বর কমছে না। দুপুরের দিকে জ্বর একটু কমলো।

তখন বাড়িতে এসে গোসল ও খাওয়া–দাওয়া করে ঘুমিয়েছিলাম। পাচটার দিকে উঠে হাত মুখ ধুতে ধুতে মনে পড়লো চন্দনের কথা। তাই এক কাপ চা খেয়ে রওনা হলাম চন্দনকে দেখতে। দেখলাম ছেলেটি তখন কিছুটা সুস্থ। পরের দিন খুব সকালে ঢাকায় আসতে হবে। তাই দেরি না করে বাড়িতে এসে সব গুছিয়ে নিলাম।

রাত বারোটায় হঠাৎ মনে হচ্ছে কে যেন হেটে যাচ্ছে জানালাটার পাশ দিয়ে। জানালা খুলে দেখলাম সেই আকাশ নামের ছেলেটি চা বাগানের ওপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে।

আশ্চর্য ঘটনা!

সে যাওয়ার সময় আমাকে দুই আঙুল দিয়ে বাই বাই দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে সকালের কোচে চলে এলাম ঢাকায়। ঢাকায় এসে মামাকে ফোন করে বললাম, ভালো মতোই পৌছেছি।

মামার কাছে চন্দনের অবস্থা জানতে চাইলে মামা বলেছিলেন ছেলেটার রাতে অনেক জ্বর এসেছিল বলে সে মারা গেছে এবং সেই শোকে তার মাও মারা গেছে।

তখন বুঝলাম আকাশের দুই আঙুল দিয়ে বাই বাই দেয়ার অর্থ।

সাভার, ঢাকা থেকে

অথচ সেদিন

– মারুফ হোসাইন মোবারক

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। প্রতিদিনের মতো মা আমার জন্য চা নিয়ে এলেন এবং আমাকে বললেন, মারুফ, ঢাকা গিয়ে তোর মামা–মামিকে দেখে আয়। ওরা কেমন আছে জানি না। ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সেই যে শীতের সময় এসে গেল আর একটিবারও এলো না। যা বাবা, ওদের খবরটা নিয়ে আয়।

মায়ের কথায় রাজি হলাম। একটু পরেই কয়েক দিনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লাম।

আমাকে দেখে মামি তো মহা আনন্দে বললেন, মারুফ বাবা। কেমন আছো, বলে জড়িয়ে ধরলেন।

মনে হলো তার ছেলেকে পেয়েছেন। মামির কোনো ছেলে সন্তান ছিল না। তাই আমাকে ছেলের মতোই জানতেন।

বললাম, ভালো, আপনি কেমন আছেন?

ভালো।

তোমার আব্বু, আম্মু কেমন আছে?

বললাম, ভালো।

মামি নিপা কোথায়? ওকে দেখছি না যে?

একটু মার্কেটে গেছে, এখনি এসে পড়বে।

একটু পরে নিপা এলো। আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেল। সঙ্গে ওর বান্ধবী রুনাও ছিল।

বললাম, নিপা, কেমন আছো?

ভালো। আপনি কেমন আছেন?

ভালো।

নিপা ছোট থেকেই সুন্দরী ছিল। ওর মায়াবী চেহারায় মনকে কেড়ে নেয়। ওর দিকে মনের অজান্তে তাকিয়ে রইলাম। মনে মনে ওকে ভালোও বেসে ফেললাম।

মারুফভাই, কি দেখছেন?

ওহ! কিছু না। চলো রুমে গিয়ে গল্প করি।

আমরা তিনজন গল্প করছিলাম। হঠাৎ নিপা উঠে বললো, মারুফভাই, চা খাবে।

চা খাওয়ার লোভটা সামলাতে পারলাম না। বললাম, হ্যা, খাবো।

নিপা একটু আড়ালে গিয়ে রুনাকে চোখ টিপে ওকে যেতে বললো। রুনা চলে গেল।

ওরা দুজন আমার সঙ্গে দুষ্টমি করার জন্য চা বানালো এবং চায়ের মধ্যে কাচা মরিচের রস মিশিয়ে আমার কাছে নিয়ে এলো। বুদ্ধিটা ছিল নিপার। সঙ্গে ওদের জন্যও আনলো।

আমাকে দিয়ে বললো, নিন, চা খান। গল্প করতে করতে চায়ে চুমুক দিতেই আমার গলা জ্বালাপোড়া শুরু হলো।

দুই বান্ধবী তা দেখে হাসছে।

এক পর্যায়ে চোখ বেয়ে পানি ঝরতে লাগলো।

নিপা আমার কাছে দৌড়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে পানি, মিষ্টি জাতীয় অনেক কিছু খাওয়ালো। আস্তে আস্তে কমে গেল।

নিপা আমাকে জোড় হাতে বললো, ভাইয়া আমাকে মাফ করে দিন। মাকে জানালে আমাকে বকবেন। মাকে বলবেন না।

স্বাভাবিক হয়ে বললাম, ঠিক আছে।

একটু পরে রুনা চলে গেল।

রুনাকে এগিয়ে দিলাম এবং আবার আসতে বললাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। নিপা পড়ার জন্য চলে গেল।

আমি অবসর সময় কাটানোর জন্য ছাদে উঠলাম।

পূর্ব আকাশে চাদ উঠেছে। চারদিকে আলোকিত হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাতে একাকি বসে আছি।

হঠাৎ নিপা এসে আমার পাশে বসলো।

আমরা দুজন কথা বলতে বলতে দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলি।

নিপা আমাকে জড়িয়ে ধরে স্বর্গ সুখ পেতে চাইলো। আমার হাতটা ধীরে ধীরে ওর বুকে টেনে নিল এবং আমার দুগাল চুমুতে ভরে দিল।

আমার শরীর শিউরে উঠলো তখন।

আমার ঠোট কামড়ে ধরলো নিপা।

আমিও আদর করলাম। হঠাৎ আমার বুকটা হাহাকার করে উঠলো। আমার এতো দিনের সততা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে? নিপা ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

স্বাভাবিক হয়ে কোনো মতে তাকে সান্ত্বনা দিলাম। ফিরে এলাম অবৈধ কাজ থেকে।

পরের দিন সবাইকে বিদায় জানিয়ে চলে এলাম।

কয়েক মাস পরে শুনি নিপার বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি বিএ অনার্স পড়ছি, অথচ সেদিনের কথাগুলো আজো মনে পড়ে। কেমন ছিলাম আমি আর কেমন ছিল নিপা।

নবাবগঞ্জ, ঢাকা থেকে

ইচ্ছার বিরুদ্ধে

ইউনিভার্সিটিতে পড়তেই আমরা বাবা মায়ের অমতে বিয়ে করি। দুজনেই বেকার থাকায় টিউশনি করে কোনো রকমে সংসার চালাতাম। বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষায় টিকলেও অর্থের জন্য চাকরি হতো না। তবুও আমরা চেষ্টা চালিয়ে যেতাম।

দেড় বছর পর সিলেটের একটি চা বাগানে আমার স্বামীর নিয়োগ কার্ড আসে। বহু দিন কোথাও আমরা বেড়াতে যাই না। তাই বেড়াতে ও চাকরির খোজ নিতে আমরা সিলেটে যাই।

চা কম্পানির মালিকের সঙ্গে আমরা কথা বলার সময় তিনি যেন বার বার আমাকেই দেখছিলেন।

যা হোক, আমার স্বামীর চাকরি হয়। কিন্তু কেন এতো সহজে চাকরি হলো তা স্বামী-স্ত্রী কেউ ভেবে দেখিনি। আমি দেখতে খুব সুশ্রী ছিলাম। তাই যে কোনো পুরুষ আমার এই আকর্ষণীয় শরীর প্রথম দর্শনেই ভোগ করতে চাইতো।

এই ঘটনার আগে জীবনে শুধু অভাবের সঙ্গেই যুদ্ধ করেছি। কেননা আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে ছিলাম। বাবার মৃত্যুর পর ভাইয়ের সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ তেমন হয় না। এখন স্বামীই আমার কাছে সব। তাই তার সুখের জন্য সব কিছু করতে চাইতাম।

কম বেতনে চাকরি হলেও এই কয় মাসে আমরা ভালোই সুখী ছিলাম। আমরা সিলেট শহরে থাকি। স্বামী সিলেট শহর থেকে অনেক দূরে চা বাগানের অফিসে কাজ করতো। দুই তিন দিন পর বাসায় আসতো।

কিছুদিন পর স্বামীর অনুপস্থিতে বাসায় মালিক আসেন। তখন তার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি কেন এতো সহজে আমার স্বামীর চাকরি হলো অর্থাৎ তা আমার এই দেহ সৌষ্ঠবের শরীরের জন্য।

সে বললো, আমি যদি তার সঙ্গে একবার সম্পর্ক করি তাহলে আমার স্বামীর প্রমোশন হবে এবং আমাকেও পার্সোনালভাবে কয়েক হাজার টাকা দেবেন। অন্যথায় আমার স্বামীর চাকরি থাকবে না। একদিন ভাবার সময় দিয়ে চলে যান।

একদিন পর সেই চা বাগানের মালিক সন্ধ্যায় বাসায় আসেন, স্বামী তখন কর্মস্থলে।

তাকে করজোড়ে অনুরোধ করি এ প্রস্তাব বাদে অন্য কোনো প্রস্তাব দিতে। হিংস্র দানবটি কোনো কথা না শুনে চট করে আমার মুখ চেপে ধরে শাড়ি দিয়ে মুখ ও হাত বেধে আমাকে নিরাবরণ করে। এরপর সারা রাতে কয়েক দফায় ভোগ করে শেষ রাতে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে কয়েক হাজার টাকা বেডে রেখে যায়।

কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীর বেতন বৃদ্ধি পায়। এরপর স্বামী বাসায় ফিরলে সব বলার ইচ্ছা থাকলেও সংসার ভেঙে যাবার আশংকায় তাকে কিছুই বলতে পারিনি।

তারপর থেকে ওই চা বাগানের মালিক টি কম্পানিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির আশায় বিদেশিদের মনোরঞ্জনের জন্য আমাকেই দাবার গুটির মতো ব্যবহার করতে থাকে। বিদেশিদের সঙ্গে প্রথমে মিশতে খুব ঘৃণা বোধ করতাম। কেননা তারা আমার এই আকর্ষণীয় শরীর কাছে পেয়ে শুধু স্বাভাবিক সেক্স করতো না, বিকৃত সেক্সও করতো। কিন্তু স্বামী ও সংসারের মায়ায় সব কিছু নীরবে সহ্য করে যেতাম।

এখন আমার স্বামী অন্য কম্পানিতে কাজ করছেন। আমরা অন্য শহরে আছি। এখন স্বামী, সংসার, বিত্তবৈভব নিয়ে জীবনের অন্ধকার স্মৃতিগুলোকে ভুলে থাকার চেষ্টা করছি।

আশা করি একদিন সব শান্ত হয়ে যাবে।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

অভিজ্ঞতা

– মীর্জা মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী

গত বছর জার্মানির ছোট শহর গুনজেন হাউজেন–এ গিয়েছিলাম সেখানকার একটা গেস্ট হাউসের নাম গ্যাসথফ হোটেল জুরপোস্ট। এখানে মজাদার চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। চায়ে ছিল ভ্যানিলা আইসক্রমের স্বাদ। এই চা দক্ষিণ আফ্রকা থেকে আমদানিকৃত। এছাড়া আরো ডজন খানেক চায়ের স্বাদ নিয়েছিলাম এখানে। চায়নিজরা চা পাতা একটা বোতলে ভরে পানিতে ভিজিয়ে রাখে। যখনই তেষ্টা পায় তখনই খায়। প্রায়ই তাদের এ বোতল বহন করতে দেখা যায়। আমাদের সঙ্গে পরিচিত বেশ কিছু চায়নিজরা বলেছিল, এটা নাকি তাদের মুটিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং বহুবিধ রোগের উপশমকারী।

জাপানিজদের মধ্যেও চা পাতা ভেজানো পানি পানের অভ্যাস দেখেছি। এগুলো বোতলে ও বিভিন্ন কনভিনিয়েন্ট স্টোরে পাওয়া যায়। পাচশ মিলিমিটার এক বোতলের দাম পড়ে দুইশ ইয়েন।

যখন আমি মিটশুবিশি কেমিকাল–এর কাশিমা প্লান্ট পরিদর্শনে যাই তখন তারা আমাদের চা পাতা ভেজানো পানি দিয়ে আপ্যায়িত করেছিল। টোকিওতে হোটেল থেকে সরবরাহকৃত গৃন টি খুব কষ্ট করে এক কাপ খেয়েছিলাম। এর স্বাদ কটু। তবে কিয়েটো সিটিতে এক মন্দির পরিদর্শন করতে গিয়ে পাশ্ববর্তী এক শপে সিউইড (See-Weed) গৃন টি খেয়ে বেশ মজা পেয়েছিলাম। বেশ কিছু কিনে এনেছিলাম। প্রতিটি টি ব্যাগের দাম পড়েছিল পচিশ টাকা।

ইনডিয়াতে চা খেতে গিয়ে এলাচির ব্যবহার বেশি দেখেছি। তবে দিল্লির টুরিস্ট প্লেসগুলোতে ডিসপোজেবল কাপে চায়ের পরিবেশন বেশ ভালো লেগেছিল।

প্রায়ই আমাদের বেশ কিছু কোরিয়ান বিজনেস পার্টনারদের কাছ থেকে গিফট হিসেবে জিন সেং (Gin Seng) টি পাই। এগুলো শুধু গরম পানি এবং মধু অথবা চিনি সহযোগে খেতে হয়। খেতে বেশ ভালোই লাগে।

এ পর্যন্ত আমার সাতটি এয়ারলাইন্সে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছে। জীবনের সবচেয়ে বাজে চা এই এয়ারলাইন্সগুলোতে ভ্রমণের সময় খেয়েছি। আমার বিশ্বাস, অনেক পাঠকই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এবার আসি আমার স্বদেশে চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে। ছোটবেলায় আব্বার সঙ্গে ওনার এক বন্ধুর বাসায় গেলে পোড়া চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা হতো। পোড়া চা বলছি এই কারণে, তারা চা পাতা পানিতে ছেড়ে এতোটাই ফুটাতো, খেতে গেলে ঠোট পুড়ে যেতো। এছাড়া এই চা খেতে তিতা লাগতো। সে ছিল এক সত্যিই তিক্ত অভিজ্ঞতা।

দিনাজপুরের সৈয়দপুরে গিয়ে একবার এক বাড়িতে গরুর খাটি এবং ঘন দুধ দেয়া চা খেয়েছিলাম যার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। এছাড়া আমার নানির হাতে বানানো চা–তে যে স্বাদ পেতাম তা কোথাও পাই না। পুরনো ঢাকার বেশ কিছু চা দোকানে চা বানাতে তারা বেশ কিছু কৌশল অবলম্বন করে। তারা চায়ের দুধে গ্লুকোজ, বিস্কিট এবং ডিম মেশায়। এই দুধের মিশ্রণ যখন চায়ের লিকারে মেশায় তখন অমৃতের স্বাদ পাওয়া যায়।

যারা নাইট কোচে ভ্রমণ করেন, বিশেষত শীতকালে তারা লেবু চা খেতে ভুলবেন না। সাধারণত বাইরে গেলে তেষ্টা পেলে সাধারণ পানি অথবা সফট ড্রিংকসের পরিবর্তে গরম চা খেতে চেষ্টা করি। কারণ এটা নিরাপদ।

ঢাকা পলিটেকনিকের হস্টেলে যখন থাকতাম তখন চা খেতে হস্টেল সংলগ্ন গেটের চা দোকান থেকে চা খেতাম। প্রায়ই দেখতাম দোকানি কনডেন্সড মিল্কের দুটো কৌটা ব্যবহার করতেন। একটা কৌটা থেকে আমাদের এক চামচ দুধ দিলেও অন্য কৌটা থেকে দুই চা চামচ দুধ দিতেন ছাত্র সংগঠনগুলোর ক্যাডারদের। একদিন দোকানির কাছ থেকে জেনেছিলাম, দ্বিতীয় কৌটার দুধে অর্ধেক পানি মেশানো থাকে। ক্যাডারদের অত্যাচারে সে এই ব্যবস্থা করেছিল।

এবার চায়ের ব্যবহার প্রসঙ্গে ছোটবেলায় দেখতাম চায়ের লিকার মেহেদিতে মিশিয়ে রঙের ঘনত্ব বাড়ানো হতো, এখনো এটা হয়।

চায়ের আরেকটা অদ্ভুত ব্যবহার দেখেছিলাম ১৯৮৭-এর দিকে। চারদিকে রব উঠেছিল গায়েবি রুটির। আমরা একটি গায়েবি রুটি পেয়েছিলাম এক প্রতিবেশীর সৌজন্যে। একটি গায়েবি রুটি একটি মাটির পাত্রে চায়ের লিকার এবং চিনি সহযোগে ঢাকনা দিয়ে একদিন রেখে দিলে পরের দিন আরেকটি রুটি পাওয়া যেতো। রব উঠেছিল এটা খেলে নাকি বিভিন্ন রোগের উপশম হয়। আমি খেয়ে কোনো উপকার পাইনি।

ইদানীং তেমন একটা চা খাই না। খেলে পেটে সমস্যা হয়। কেন হয় বুঝতে পারছি না।

পরিশেষে বলি, যারা গোলাপ ভালোবাসেন তারা তাদের টবে ব্যবহৃত চা পাতা দিতে পারেন। ভালো ফল পাবেন।

দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা থেকে

মাসল

– মোহাম্মদ সায়েদ উল হাসমত

স্কুল কলেজে টিফিন টাইম বলে দশটা থেকে এগারোটার দিকে যে সময়টা পাওয়া যায়, ক্যাডেট কলেজে তার নাম *মিল্ক ব্রেক*। এ সময় দুধ সহযোগে সামান্য নাশতা পরিবেশন করা হয়। আর বিকেলের হালকা নাশতা পানীয়ের নাম হলো *টি ব্রেক*। নামেই বোঝা যাচ্ছে এখানে দুধের পরিবর্তে চা পরিবেশন করা হয়।

সন্ধ্যার আগে টি ব্রেকের এ সময়টা খুবই সংকীর্ণ। গেমস, গেমসের পর দ্রুত গোসল এবং মাগরিবের নামাজে হাজিরা দেয়ার ফাকে সময়টা যেন হুশ করে উড়ে যায়। তার উপর লাইন করে দাড়িয়ে থাকা এবং লাইন ধরে ডাইনিং হলে আসার ভেতরও সমস্যা কম নেই। তাই যখন নাশতার পর আয়েশ করে গরম চায়ের কাপে চুমুক দিতে যাই তখনই পৃফেক্টরা তাড়া লাগায়। তা না হলে নামাজে দেরি হয়ে যাবে। এভাবে জিভ পুড়িয়েছি বেশ কয়েকবার।

পরে একটা উপায় বের করে নিয়েছিলাম। তাড়াহুড়া লাগলে অম্লান বদনে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিতাম চায়ের কাপে। চা পরিণত হতো শরবতে। এক চুমুকে শেষ করে ফেলতাম এক কাপ চা। অন্যদের অবাক দৃষ্টি উপভোগ করতাম খুব।

মোহাম্মদ জাফর ইকবালের *বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহাআবিষ্কার* বইটা আমাদের ক্লাসে খুব হিট ছিল একটা সময়। বিশেষ করে বানর চরিত্র জং বাহাদুর। কয়েকজন তো জং বাহাদুরের মতো অঙ্গ সঞ্চালনও শুরু করেছিল। বইয়ে চা-তে ডুবিয়ে কলা খাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। বন্ধুদের কয়েকজন টি ব্রেকে ওই কাজ শুরু করলো, বাকিরা ব্যাপারটাতে আমোদ পেয়েছে খুব।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা চলাকালীন এবং প্রস্তুতিকালীন অধিক রাত জেগে লেখাপড়া করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ রাত দশটা নাগাদ একটা বিশেষ টি ব্রেকের আয়োজন করেন। শুধু পরীক্ষার্থীরা এ সময় চা বিস্কিট পেতে পারে। ক্যাডেটদের রাত জাগার জন্য চায়ের প্রয়োজন খুব একটা হয় না। তবুও দল বেধে ডাইনিং হল

পর্যন্ত যেতে, সবার সঙ্গে নাতিদীর্ঘ একটা আড্ডা মারতে সবারই ভালো লাগতো। সন্ধ্যা থেকে একটানা পড়ার ক্লান্তি কাটাতে ব্যাপারটা কাজে লাগতো সন্দেহ নেই।

ফল কিনে খাবার চেয়ে গাছ থেকে পেড়ে খাবার মজা বেশি। বিশেষ করে তা যদি নিষিদ্ধ গাছের ফল হয় তবে তো থৃলটাই আলাদা। রাতকালে চা ব্যবস্থা সবারই এ রকম মনমতো হতো না। নিজের মতো করে চা বানিয়ে, খাবার চুরি করা ফলের মতো থৃল খুজতে চাইতো অনেকে। সে রকমই একজন আমাদের রাজীব।

তার শখ ছিল ইলেকট্রনিক্স। এটা-ওটাকে তার প্যাচিয়ে এটা-সেটা বানিয়ে বেশ হাত পাকিয়েছিল রাজীব। প্রথম দিকে এটা নিয়ে খোচাখুচি করলেও ওর দখল দেখে আমরা সবাই খানিকটা করতে শুরু করেছিলাম। এর পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপারে ও হাত পাকিয়েছিল। তা হলো, বডি বিল্ডিং ও মার্শাল আর্ট। এটাতে ওর দখল কতোটুকু তা যাচাই করা যায়নি। তবে মাঝে মধ্যেই আমাদের কাউকে খাটের ওপর চড়িয়ে ও নিচে শুয়ে পুরো খাট ধরে উচু-নিচু করতো। এমনো শোনা যায়, রাজীব শরীর শক্ত করে দাড়িয়ে থাকতো আর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাউকে কাউকে বলতো আগাপাশতলা পেটাতে।

এ রকম সুযোগ কেউ হাতছাড়া করতো না। এটা করতে করতে ওর হাতের, শরীরের মাংসপেশিগুলো থোক থোক আকার পেয়েছিল। রাজীব সেটা প্রদর্শনে কার্পণ্য করতো না। প্রতিদিন কাজে অনাবশ্যকভাবে হাতের মাসল ব্যবহার আমাদের খোচাখুচির বিষয়ে পরিণত হয়েছিল, এবং বলা বাহুল্য, এ কারণেই সে অনেকগুলো বিশেষণে ভূষিত হয়েছিল।

রাতের চা খাবার জন্য যখন আমরা সবাই দল বেধে রওনা দিচ্ছি তখন লুকানো স্থান থেকে ওর চা বানানোর সরঞ্জামগুলো বের হতো। উল্লেখ্য, এ সমস্ত সরঞ্জাম ক্যাডেট কলেজে নিষিদ্ধ। ধরা পড়লে যথেষ্ট নাকাল হবার সম্ভাবনা।

বরিশাল ক্যাডেট কলেজের ক্যাডেটদের রুমে কোনো সকেট নেই। রয়েছে দুটি ফ্যান এবং তিনটি লাইটের জন্য সর্বসাকুল্যে পাচটা সুইচ। তাই আমাদের ইলেকট্রিক আউটপুটের দরকার হলে আমরা যে কোনো সুইচের ঢাকনার একটা স্ক্রু পুরো এবং অন্য স্ক্রু আধখোলা রেখে তার ভেতর টু পিন প্লাগ ঢুকিয়ে দিতাম। এতে খুব সুন্দর কাজ সমাধা হতো। প্লাগের পিন আর সুইচের দুটো প্রান্ত খুব বেশি ঢিলা হয়ে গেলে বেধে রাখার ব্যবস্থা করতাম। ব্যাপারটা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই। তবে একটু-আধটু শক খাওয়া কোনো ব্যাপার না।

আমাদের রাজীবের চা বানানোর সরঞ্জামের মধ্যে ওই রকম একটা প্লাগ, প্লাগের সঙ্গে সংযুক্ত লম্বা তার এবং তারের মাথায় একটা হিটার লাগানো ছিল। বলা বাহুল্য, এই হিটারটা রাজীবেরই বানানো। একটা পুরনো ব্লেডের ওপর অসংখ্যবার তার প্যাচিয়ে সেটি তৈরি করা। হিটারের পাশাপাশি পানি গরম করার জন্য মগ, চিনির কৌটা, গুড়ো দুধের কৌটা আর টি ব্যাগের প্যাকেট বের হতো লুকানো স্থান থেকে। তার চা বানানোর পুরো প্রক্রিয়াটা ছিল দেখার মতো।

প্রথম প্রথম আমরা তার এই চা বানানো পর্ব দেখা এবং চা খাওয়াটা সেখানেই সারার মতলবে ঠিক সময় মতো রাজীবের রুমে হাজির হতাম। কিন্তু গিয়ে গ্যাঞ্জাম করতাম বেশি। কেউ হয়তো গরম হয়ে ওঠা পানির অর্ধেকটা নিয়ে নিল, কেউ হয়তো এক চামচ চিনি মুখে দিয়ে তা দেশি না ইনডিয়ান তার বিচার শুরু করলো, কেউবা পাউডার দুধের মসৃণতা ট্যালকম পাউডারের সঙ্গে তুলনা করার জন্য মেঝেতে ছিটিয়ে দিল খানিকটা, কেউ হয়তো টান দিয়ে হিটারের কানেকশনটাই দিল খুলে।

এ সবই আমরা করতাম শার্টের হাতা গুটিয়ে। অনাবশ্যক মাসল ফুলিয়ে, রাজীবকে দেখিয়ে। ত্যক্ত-বিরক্ত রাজীব পরিবর্তীকালে চা খাবার সময় হলেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিতো।

তাতে আমাদের উৎসাহে কমতি হতো না। জানালায় ভিড় লাগিয়ে আমরা তামাশা দেখতাম। বই-খাতা টেবিল থেকে তিরোহিত হতো। সেখানে পানির মগে পানি গরম হচ্ছে। সাময়িক বিরতি নিয়ে রাজীব পাশে

অপেক্ষা করছে। ইচ্ছা আছে চা খেয়ে সারা রাত এমন পড়া পড়বে যে, বিদ্যাসাগর ফেল। পানির মগে বাষ্প দেখা গেলে রাজীব হ্যাচকা টানে হিটারের কানেকশন খুলতো।

ধোয়া ওঠা পানিতে প্রয়োজন মতো চিনি দুধ দিয়ে ও একটা টি ব্যাগ নিয়ে বিছানায় উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসতো। সেখানে চামচ নাড়তে নাড়তে চলতো ওর এক মগ চা খাওয়া। পুরো সময়টাতে ওর হাতের মাসল টগবগ করছে। স্যান্ডো গেঞ্জির আশপাশ দিয়ে মাসলের উকিঝুকি যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। পুরো ঘণ্টা খানেক লেগে যেতো ওর এই চাপান পর্বে।

চা শেষ করে মগটা টেবিলের ওপর রেখে রাজীবের মনে হতো উফ! অনেক পরিশ্রম হলো। চা খাওয়া তো নয়, যেন দুই মাইল দৌড়! একটু রেস্ট নিই। এই বলে দেয়ালে হেলান দেয়া রাজীব বিছানায় এলিয়ে পড়া রাজীবে পরিণত হতো, হয়তো বা সর্বোচ্চ দশ মিনিটের কথা মাথায় রেখে, কেননা সারা রাত পড়তে হবে। কিন্তু কিভাবে যে কি হতো, রাজীবের ঘুম ভাঙতো পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় আমাদের ধাক্কাধাক্কিতে!

চা বানিয়ে, চা খেয়ে ওই চা বানানোর পরিশ্রমেই যে এ রকম লম্বা ঘুম দেয়া যায় তা আমার বন্ধু রাজীবকে দেখেই শিখেছিলাম। বিশেষ কাজ ও চারিত্রিক বৈশিষ্টের ওপর ভিত্তি করে বিচিত্র টাইটেল দেয়া আমাদের ক্যাডেট কলেজ জীবনের একটা বিশাল বিনোদন।

রাজীবের চা বানানো এবং তা খেয়ে মরার মতো ঘুম দেয়ার ওপর আমাদের আরো একটা টাইটেল খুজতে হয়েছিল। আমার টাইটেল প্রতিভার বন্ধুরা সে কাজটি খুব আনন্দের সঙ্গেই করেছিল।

ঢাকা থেকে

sayed-734@yahoo.com

তৃষ্ণার্ত

– খন্দকার হাসানুজ্জামান

চা আমার প্রিয় পানীয়। প্রতিদিন আট থেকে দশ কাপ চা খাওয়া হয়। এই চা খাওয়া নিয়ে কষ্ট পেয়েছি, অনেক অপমানিত হয়েছি। এর কারণ হলো, পকেটে টাকা থাকতো না, কাউকে খাওয়াতে পারতাম না। কিন্তু তাদের টাকায় চা খেতে হতো।

যেমন বন্ধুরা সবাই চায়ের দোকানে বসে আছি। চায়ের অর্ডার দেয়া হয়েছে। কিন্তু এদের মাঝে কেউ কেউ বলতো, হাসান চা খাবে না।

অথচ চা খেতে আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে। লজ্জায় অনেক সময় বলতে বাধ্য হয়েছি, চা খাবো না। কিন্তু মনে মনে চায়ের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলাম।

জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে

নুড বিচে ঘুম

– কান্তি

আমার দাদা ১৯৬৭ সালে রাজশাহী মেডিকাল কলেজের সিভিল সার্জন ছিলেন। ওই বছরই তিনি অবসরে যান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে তিনি লেফটেনান্ট হিসেবে ১৪ নাম্বার ব্যাটালিয়নে বার্মার যুদ্ধে অংশ নেন জাপানিজ আগ্রাসন রুখে দেয়ার জন্য।

আজ লিখতে গিয়ে দাদুভাইয়ের কথা খুব মনে পড়ছে। তার জীবদ্দশায় কোনোদিন চা খাইনি। ওখানে ছোটদের চা খাওয়া এক রকম নিষিদ্ধ ছিল।

মানুষ অভ্যাসের দাস। তাই আমার চা পানের অভ্যাসটা নেশার পর্যায়ে যায়নি দাদুর বাড়িতে জন্ম হওয়ার সুবাদে। তবে চা খাওয়া কারো দ্বারা অ্যাকম্পানিড হলে, যেমন বাসায় অতিথি বেড়াতে এলে তাদের সঙ্গে বসে চা খাই। কিংবা কোথাও বেড়াতে গেলে চা খাই।

আমি মার্চেন্ট শিপের চিফ অফিসার। একবার এক জাহাজে পানি বোধহয় খুব কমই খেয়েছি। সেখানে সারাবেলা গৃন টি–র ব্যবস্থা ছিল। অন্য এক জাহাজে ছিল হারবাল চা খাওয়ার প্রচলন। এই বিশেষ হারবাল চায়ের নামটা আমার ঠিক মনে নেই। ঘুমানোর আগে হারবাল চা খেয়ে ঘুমাতাম। অদ্ভুত এক সুখের আমেজে ঘুমিয়ে যেতাম। এই চা শুধু আমি আর ক্যাপ্টেন খেতাম।

চায়নার এই হারবাল চায়ের বদৌলতে একবার খাল কেটে কুমির এনেছিলাম মেক্সিকো–তে। তখন মেক্সিকো প্রায় যাওয়া হতো একটা পানামানিয়ান বাল্ক ক্যারিয়ারে। আমাদের লোডিং পোর্ট ছিল মায়া সভ্যতার ঐতিহ্যে আলোচিত ভূগর্ভস্থ নদীর শহর Punta Venado। বিখ্যাত Cozumel বিচ–এর খুবই কাছে যা প্রকৃতি পূজারিদের ছিল আকর্ষণীয়। আমার দেখা প্রকৃতি প্রেমিকদের কিংবা প্রেমিকাদের প্রেমটা ছিল একটু অতিমাত্রায়। এদেরকে কেউ কেউ বলতে পারেন Nature Loving People (নেচার লাভিং পিপল)।

শুধু কি তাই? এরা ছিল প্রকৃতি পূজারি। তাই তো নিজেদের প্রকৃতির সন্তান বলতে পিছপা হননি কেউই – তাদের থাকে না কোনো কৃত্রিমতার বাধন, থাকে না কোনো ধর্মীয় অনুশাসন। এখানে থাকছে শুধুই নগ্নতা। Naturist (নেচারিস্ট)–দের ভাষায়, এটা দোষের কিছু না। কারণ এ নগ্নতায় কোনো পাপ নেই।

আজকের এই উন্নত বিশ্বে শুধু নয়, অতীতে জার্মানিতে নেচারিস্টদের Nudism (নুডিজম বা নগ্নতা) চর্চা ছিল তুঙ্গে। তাদের ভাষায়, নগ্নতা পোশাকি মন নয় বরং পরিষ্কার মনের প্রকাশ। নগ্ন মানুষের নিজেকে লুকোনোর স্কোপ খুবই কম। অথচ পোশাকি মানুষ সাধারণতঃ জটিল এবং দুর্ভেদ্য থাকে দেহ তার ও মন (?)–কে পোশাকের অন্তরালে লুকিয়ে রাখার কারণে।

সে ব্যাখ্যায় আজ আর না যাই। তবে যা বললেই নয় তা হলো Naturist আর Naturism–কে নিয়ে Naturalist এবং Naturalism শব্দের সঙ্গে মেশাবেন না।

এক দুপুরবেলায় গিয়েছিলাম এমনই একটা Naturist Beach-এ। দিগম্বর না হয়ে ঢুকতেই দেবে না গেটের Bouncer (বাউন্সার বা বিশালদেহী সিকিউরিটি রক্ষক) গোছের এক লোক।

কোনোভাবে ম্যানেজ করে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলাম সেদিন। শর্টস পরে ছিলাম, চোখে ছিল সানগ্লাস। একটা হ্যান্ডব্যাগে ছিল গরম পানি, হারবাল চা, ঘড়ি ও ডলার। ভেতরে ক্যামেরা নেয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা ছিল।

অনেকক্ষণ সি–বিচে হাটাহাটির পর ক্লান্তিতে একটু ঝিমোতে চাচ্ছিলাম।

মেক্সিকো উপসাগরের তীরে বসে এক সময় হারবাল চা খেলাম। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি সর্বনাশ! হ্যান্ডব্যাগটা দেখছি না। তার মানে ডলার ও হাতঘড়িটাও খোয়া গেছে।

আমিই সেদিন চা খেয়েছিলাম। আমাকে চা খাইয়ে কেউ প্রতারণার আশ্রয় নেয়নি। সবাই চা খায় ঘুম এড়ানোর জন্য আর আমি সেদিন খেয়েছিলাম একটু প্রশান্তির ঘুমের জন্য *হারবাল টি*। নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য খুবই আফসোস হচ্ছিল। বিদেশের মাটিতে টাকা–পয়সা হারানোর মতো বিপদ দ্বিতীয়টি নেই। সিম্যান হওয়াতে ফিরে যাওয়ার গন্তব্য ছিল আমার জাহাজ। তাই রক্ষা।

রানীনগরপাড়া, রাজশাহী থেকে
mism72@yahoo.com
safkat2001@yahoo.co.uk

সকাল সন্ধ্যার সঙ্গী

– অণু

সকাল বেলায় চা খেতে খেতে আম্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কবে থেকে আমি চা খাই বলো তো? কেউ জানতে চাইলে কি বলবো?

বলবি দুই বছর বয়স থেকে। আম্মা বললেন।

সত্যিই আমি অতোটুকু বয়স থেকেই চা খাই। সদ্য নামানো ধোয়া ওঠা চা ছাড়া দিন যেন জমে না। চোখ বন্ধ করে পরম তৃপ্তিতে কাপে ঠোট ছোয়ানোতে যে কি সুখ তা একমাত্র চায়ে নেশাগ্রস্তরাই জানে। মনে পড়ে, ছোটবেলায় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মলিনাকে বলতাম, মলিনা, আমার চা দে।

মলিনা রুটি বেলতে বেলতে চুলার পাশে থাকা ছোট হাড়ি থেকে কাসার বাটিতে চা ঢালতো।

আমার বাটি ভালো লাগতো না, কাপও না। বলতাম, আমাকে হাড়িসুদ্ধই দে।

কথাটা শুনে বোনেরা হাসতেন।

তারপর গরম রুটি আর চা মজা করে খেতাম। কি যে ভালো লাগতো!

এখন অবশ্য খাই না। বহুদিন খাই না। ভালো লাগে না রুটি দিয়ে খেতে। এখন টোস্ট আর লাল চা দিয়ে দিন শুরু করি।

বিভিন্ন জায়গায় অসংখ্য হাতের চা খেয়েছি। কিন্তু আমার ছোট খালার লাল চায়ের মতো স্বাদ কোথাও পাইনি। তার হাতের চা প্রতিটা দিন একই রকম হয়। কখনো লিকার কম বেশি হয়নি, আদার পরিমাণও সে রকম।

চা নিয়ে একবার মজার কাণ্ড ঘটেছিল। সালটা ১৯৯৭। পড়ি ক্লাস নাইনে। সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে আমার এক চাচাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে সবাই গ্রামে গিয়েছিলাম। ওখানকার নাকি নিয়ম, বরযাত্রী এলে চা বিস্কিট দিয়ে আগে আপ্যায়ন করতে হয়।

চা করার দায়িত্ব আম্মার ওপরে। আম্মা বেচারী বুঝতে পারেননি কতোটুকু করবেন। তাই বিশাল এক পাতিলে পানি ফোটাতে দিয়েছেন।

তারপর যে পরিমাণ চা হলো তাতে বরযাত্রী, কনে বাড়ির লোক কেউ–ই শেষ করতে পারলো না। অনেক থেকে গেল।

ওই গ্রামের অন্য বাড়িগুলোতে এ খবর পৌছাতে সময় লাগলো না। পিচ্চি ছেলেমেয়েগুলো কেউ বড় গ্লাস, কেউ ছোট পাতিল, কেউ কেউ বদনা পর্যন্ত নিয়ে এসে চা নিল এবং এমন এক ভঙ্গিতে এগুলো নিয়ে গেল যে, হাসাহাসি শুরু হলো। বোন গিয়ে ভাইকে আনছে, ভাই গিয়ে বোনকে। যেন অমৃতের সন্ধান পেয়েছে।

হাসি পেল ঠিকই কিন্তু এসব গরিব মানুষ যারা কখনো ঠিকমতো খেতে পায় না তাদের কাছে চা যে একটি বিস্ময়কর পানীয়, কৌতূহলী জিনিস তা বুঝতে পারলাম। তাদের কাছে চা–এর স্থান বিলাসিতারও অনেক ঊর্ধে।

শাহানা নামের একটি মেয়ে আমাদের বাসায় কাজ করতো। আমাদের সঙ্গে সেও সকাল– বিকেল চা খেতো। একদিন তার মা এসে আম্মাকে বললেন খালা, আমার বিটিক কি খাওয়াচ্ছেন। আমরা গরিব মানুষ। বাড়িত গেলে কি খাবে? চায়ে যে নেশা ধরে।

আম্মার ওই এক স্বভাব, সবাইকে চা খাওয়াতে চাইবেন। এ জন্যই তো অতো ছোটবেলা থেকে চা ধরা হয়েছে। দুই তিন বছরের দুটো ভাতিজাও চায়ের জন্য পাগল। সকালবেলা চা খেতে গেলে বলবে, *অন্নু, তোমার চা নাই*।

তখন আমাকে একটু পাগলামি করতে হয়।
ওরা আবার বলে, আছে, চা আছে।

সাধুর মোড়, রাজশাহী থেকে

ভালোবাসার রঙ

– আজম মিজান

বিথীর সঙ্গে আমার পরিচয়টা বন্ধুত্ব দিয়ে। বন্ধুত্ব হয় মূলত লেখালেখির মাধ্যমে। আমি *লিটল ম্যাগাজিন* থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতীয় সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজে মাঝে মধ্যে একটু–আধটু লেখার চেষ্টা করি।
বিথীও বিভিন্ন ছোট কাগজে লেখে। ওর ছোট গল্প লেখার হাত চমৎকার।
দিনের পর দিন আমি ওর প্রতি একটু বেশিই কৌতূহলী হয়ে উঠি। ওর ঠিকানা সংগ্রহ করে আমার প্রকাশিত লেখার অনুলিপি, আমার সম্পাদিত বিভিন্ন সময়ের লিটল ম্যাগাজিন সৌজন্য হিসেবে ওর কাছে এক সময় পাঠাই।
বিথী আমার পাঠানো লেখার অনুলিপি ও লিটল ম্যাগাজিনগুলো পেয়ে ভারী খুশি হয়। লিটল ম্যাগাজিনে আমার মোবাইল নাম্বার পেয়ে বিথী আমাকে ফোন করে।
জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগলো লিটল ম্যাগজিনগুলো পড়ে?
ভালো লাগলো।
কেমন ভালো?
আজ চা খাওয়ার মতো ভালো।
বিথীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হতে থাকে। আর এই বন্ধুত্ব গড়িয়ে এক সময় প্রেমে রূপান্তরিত হয়।
বিথী রাজশাহীর মেয়ে। আর আমি কুমিল্লা থেকে দশ বছর হয় শ্রীমঙ্গল শহরে এসে বসবাস করছি।
বিথী জানায়, শ্রীমঙ্গল দেখার তার বহুদিনের শখ। শ্রীমঙ্গলের চা বাগান, সবুজের সমারোহ, বিটিআরআই, শ্যামলী, শ্রীমঙ্গলের অদূরে মাধবপুর লেক, মাগুড়ছড়া, মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতের কথা সে লোকমুখে অনেক শুনেছে, পত্রিকায় ফিচার পড়েছে। কিন্তু কখনো আসা হয়নি। সে চায় বাস্তবে এসে চায়ের সুবজাভ গালিচায় গা এলিয়ে দিয়ে আমাকে ভালোবাসার গল্প শোনাতে!
বিথী বলে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ওর ছোট ভাই বান্নাকে নিয়ে শ্রীমঙ্গলে বেড়াতে আসবে। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ – এভাবে পুরো মাস যায়। বিথীর আসার সময়ই হয় না!
এই মধ্যে বিথী আমাকে রাজশাহীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়। শ্রীমঙ্গলের প্রিয় চা নিতে যেন ভুল না করি সেটাও মনে করিয়ে দেয় আমাকে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সময়ে রাজশাহী যেতে পারলাম না।
বিথীকে মোবাইল করে জানাতে চাইলাম কুরিয়ার করে চা পাতা পাঠিয়ে দিলে হবে কি না। কিন্তু বিথী চা এবং আমি একই সঙ্গে দুয়ের উপস্থিতি চায়! আমাকে সে নিজ হাতে চা বানিয়ে খাওয়াতে চায়। তার অদ্ভুত আবদার রাখতে পারিনি বলে অনির্দিষ্টকালের জন্য মোবাইল অফ রাখলো। কুরিয়ার করে কতো চিঠি যে দিলাম, একটিরও উত্তর দেয়নি। আমাকে ফোন করা একদম ছেড়ে দিয়েছে।
এর দুই মাস পরই দুই কেজি ক্লোন চা নিয়ে রাজশাহীতে বিথীর কাছে রওনা হলাম। বিথীকে একমাত্র চিঠি দিয়ে জানানো ছাড়া আমার রাজশাহী যাত্রার সংবাদ জানানোর বিকল্প কোনো পথ ছিল না। তাই সংবাদ না দিয়েই রাজশাহী চললাম। ওর বাসা নগরীর ভাটিপাড়া এলাকায়। সমস্ত এলাকাটিতে তখন সাজ সাজ অবস্থা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে।

বিথীর বাসায় যাওয়ার রাস্তায় লাইনে দাড়িয়ে আছে অনেকগুলো প্রাইভেট কার। রিকশা আর ভেতরে যাচ্ছে না। রিকশা থেকে নেমে চা পাতার প্যাকেটটি হাতে নিয়ে কাধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বিথীর বাসার দিকে এগিয়ে গেলাম। লক্ষ্য করলাম বিথীর বাসার ছাদে বিয়ের প্যান্ডাল। ওখান থেকে অনেক লোকজনের কথা ভেসে আসছে। গেট দিয়ে লোকজন আসা-যাওয়া করছে।

আমি থ হয়ে দাড়িয়ে রইলাম। আমার পা আর গেটের ভেতর ঢুকছে না। কয়েকজন তরুণ বয়সী মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি বিয়েতে এসেছেন।

উপায়ান্তর না পেয়ে বললাম, হ্যা। জিজ্ঞাসা করি কার বিয়ে হচ্ছে?

আমার কথা শুনে মেয়েগুলো সমস্বরে হেসে ওঠে। ওমা! বিয়েতে এসেছেন, অথচ কার বিয়ে জানেন না?

তরুণ বয়েসী একটি ছেলে গেটে এগিয়ে এলে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, এখানে বিথী আছে?

বিথীকে দিয়ে আপনার কি দরকার। বিথীর তো আজ বিয়ে ...।

বিথীর বিয়ে শুনতেই মাথাটা হঠাৎ করে ঘুরে যায়! তখন আমার মনে হচ্ছে ক্রমেই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি।

আমার অবস্থা দেখে তরুণ ছেলেটি আলাদা একটি রুমে আমাকে ধরে নিয়ে বসালো।

আচ্ছা বলুন তো, আপনি কে?

আমার পরিচয় জেনে আপনি কি করবেন?

দেখুন, ভণিতা করবেন না। আমি বিথীর ছোট ভাই বান্না। আমার কাছে সব খুলে বলুন। তাছাড়া এই মুহূর্তে বিথীর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।

অবাক হয়ে বান্নাকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার পরিচয় দিতেই বান্না জিভে দাত বসালো।

বললো, সর্বনাশ করে ফেলছেন। বলেই বান্না আমার পা জড়িয়ে ধরে বললো, প্লিজ মিজানভাই, আপুর সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা কাউকে বলবেন না। নয়তো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আপনার কাছে মাফ চাই, এই সর্বনাশ আপনি করবেন না। আপনি খুবই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, চলুন আপনাকে অন্য কোথাও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই। এখানে আপনি আর এক মুহূর্ত থাকলে আপুর বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে।

চা পাতার প্যাকেটটা বান্নার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, চা পাতাগুলো বিথীর জন্য এনেছিলাম। পারলে ওকে দিও। আমি এখনই, এ মুহূর্তে শ্রীমঙ্গল ফিরে যাচ্ছি। বলে ব্যাগটা কাধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রাজশাহী থেকে ঢাকা অভিমুখী আমাদের বাসটি হাই স্পিডে চলছে। সিটের পাশের জানালাটা খুলে দিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলোর দিকে চোখ রেখে কতো কি ভাবছি। ভাবছি বিথীর সঙ্গে আমার কয়দিনের ভালোবাসার কথা। সেই ভালোবাসার রঙ কিভাবে হঠাৎ করে বদলে গেল, তাই ভাবছি। ভাবছি শ্রীমঙ্গলের কয়েক রঙা চায়ের কথা। দুই কালার, তিন কালার, পাচ কালার চা তৈরি হয় শ্রীমঙ্গলের বিটিআরআই-এ। তাই কালো চা পাতা গরম পানিতে দিয়ে কতো রঙ যে ধারণ করে তার কোনো হিসাব নেই। এই চায়ের সঙ্গে দুধের মিশ্রণ ঘটালে রঙ বদলে যায়। যেমন করে বদলে গেছে বিথীর মনের রঙ, ভালোবাসার রঙ। আমি এখন চায়ের হরেক রকম রঙ ও ভালোবাসার রঙের মধ্যে কোনো পার্থক্য খুজে পাই না।

শ্রীমঙ্গল থেকে

সহঅবস্থান

– মিঠু

ছোটবেলা থেকেই চায়ের প্রতি আমার প্রগাঢ় ভালো লাগা ছিল। কিন্তু আমার স্বামী ছিল খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে প্রটেকটিভ মানসিকতার মানুষ। সে ভাবতো, চা একটি কড়া পানীয়। এটি পান করলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। সে বাসায় চা পাতা আনতো না।

এদিকে আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা হতো আগের অভ্যাস মতো চা খেতে। বাবার বাড়ি গেলে ব্যাগের ভেতর জামা-কাপড়ের নিচে লুকিয়ে চা পাতা নিয়ে আসতাম। সে বাসায় না থাকলে লুকিয়ে চা বানিয়ে খেতাম।

দুজন মানুষ যখন সহঅবস্থান বা কো-এগজিস্ট করে তখন একে অপরের অভ্যাসকে নিয়ে নেয়। সুদীর্ঘ সময় পাশাপাশি থাকতে থাকতে এখন আমার স্বামী বিকেল হলে অস্থির হয়ে যায় চা খাবার জন্য। মনে হয় সমস্ত দিনের সুখ লুকিয়ে থাকে দুজন এক সঙ্গে বসে চা খাওয়ার মধ্যে। কখনো কোনো অতিথির সঙ্গে অথবা আমার কোনো ছাত্রীর অপেক্ষমাণ মায়ের সঙ্গে যদি আমার স্বামীকে ফেলে চা খেয়ে ফেলি, সে মনে খুব কষ্ট পায়। মনে হয় তাকে বাদ দিয়ে আমি অতি আনন্দের কিছু করে ফেলেছি।

ধানমণ্ডি, ঢাকা থেকে